ছবি:কুনাল বর্মণ

বরফ দেশের ছায়ামানুষ

হিমাদ্রিকিশোর দাশগুপ্ত

তাঁবুর বাইরে এসে মুগ্ধ হয়ে গেল সুদীপ্ত। দু' দিন পর মেঘ কেটেছে। সকালের আলোয় ঝলমল করছে চারদিক। যেদিকে তাকানো যায়, সেদিকেই নীল আকাশের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে সার-সার তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গ। ওদের মধ্যে কয়েকটা শৃঙ্গ অবশ্য চেনা সুদীপ্তর। নন্দাঘাট, ত্রিশূল,

নন্দাদেবী। তবে বেশিরভাগটাই অজানা। এই নেপাল-হিমালয়ে এমন অনেক শৃঙ্গ আছে, যেখানে এখনও মানুষের পদচিহ্ন আঁকা হয়নি। উচ্চতায় হয়তো তাদের মধ্যে অনেকেই তেমন বিখ্যাত নয়, কিন্তু দুর্গমতায় অনেক সময় তারা মাউন্ট এভারেস্টকেও পিছনে ফেলে দেয়। সুদীপ্ত আর একজন পোর্টারকে এই বেসক্যাম্পে রেখে গতকালই সুদীপ্তর পর্বতারোহী বন্ধুরা যাত্রা করেছে তেমনই এক আপাতঅখ্যাত কিন্তু দুর্গম 'শিবের জটা' পর্বতশৃঙ্গ সামিট করতে।

এই বেসক্যাম্প অঞ্চলটা সমতল হলেও প্রচণ্ড ঠান্ডা। চারপাশের পাহাড়গুলো থেকে ভেসে আসা ঠান্ডা বাতাস সুদীপ্তর ফার ও চামড়ায় ঢাকা ওভারকোট আর তার ভিতরের জ্যাকেট ভেদ করে হাড় কাঁপিয়ে দিচ্ছে। এসব জায়গায় আকাশ যত মেঘমুক্ত হয়, বাতাস আর ঠান্ডার প্রকোপ তত বাড়ে। এদিনটাও তেমনই।

কিছুক্ষণ বাইরে দাঁড়িয়ে থাকার পর সুদীপ্তর মনে হল, তাঁবুর ভিতর থাকাই ভাল ছিল। সুদীপ্তর তাঁবু বলতে যা বোঝায়, তা হল চারদিকে পাথরের টুকরো সাজিয়ে ফুটচারেক উঁচু দেওয়াল, আর তার মাথায় প্যারাশুট কাপড়ের ছাউনি। তার ভিতর গুটিসুটি মেরে দু'জন লোক থাকতে পারে। ভিতরে শোওয়া-বসা যায়, তবে দাঁড়ানো যায় না। এখানে সব তাঁবুগুলোরই এরকম অস্থায়ী ছাউনি, শুধু একটা মাত্র ছাদওয়ালা বাড়ি আছে। কাঠের ছাদওয়ালা পাথরের বাড়ি। সেখানে ঘাঁটি গেড়েছে নেপাল সরকারের বনবিভাগের একটা দল। তারা নাকি তুষারচিতার খোঁজে যাচ্ছে।

সুদীপ্তকে এই বেসক্যাম্পে অন্তত দিন দশ-বারো থাকতে হবে তার বন্ধুরা এক্সপিডিশন শেষ করে না ফেরা পর্যন্ত। সারাদিন তো আর তাঁবুর মধ্যে বসে থাকা যায় না, হাত-পায়ে খিল ধরে যাচ্ছে। তাই বাইরে বেরিয়েছে সুদীপ্ত। চারপাশে তাকাতে-তাকাতে সুদীপ্ত হঠাৎ কিছু দূরে পাহাড়ের ঢালে বাড়ির মতো আরও একটা কাঠামো দেখতে পেল। পাইন গাছের ঘন বন ও জায়গাটাকে বেশ কিছুটা আড়াল করে রেখেছে। সুদীপ্তর পাশেই দাঁড়িয়েছিল এখন এখানে তার একমাত্র সঙ্গী পোর্টার তাশি। মাঝবয়সি লোক। কিন্তু প্রচুর পরিশ্রম করতে পারে আর বেশ ভাল ইংরেজি বলতে পারে। বহুবার এ তল্লাটে এসেছে সে এক্সপিডিটর বা অভিযাত্রী দলের সঙ্গে। সুদীপ্ত তাকে জিজ্ঞেস করল, "পাইন বনের ওপাশে ওটা কী দেখা যাচ্ছে?"

তাশি বলল, "ওটা একটা মনাস্ট্রি। বৌদ্ধ গুম্ফা। এক্সপিডিশনে যাওয়ার আগে অনেকে ওখানে পুজো দিতে যায়। ওখানে পুজো দিলে পাহাড়ের দানোরা আর কিছু করতে পারে না। আপনি চাইলে ওখানে আপনাকে নিয়ে যেতে পারি।"

"পাহাড়ের দানো মানে?"

তাশি তার কানের লতিতে আঙুল ছুঁইয়ে বলল, "দানো মানে, ওই যারা ওই সব পাহাড়ের মাথায় থাকে। যারা হঠাৎ তুষার ঝড় নামিয়ে আনে, পায়ের নীচের বরফ ফাটিয়ে মানুষকে নীচে টেনে নেয়, রোপ ক্লাইম্বিং-এর সময় দড়ির হুক খুলে দেয়, পাহাড়ের মাথায় তাঁবুতে শুয়ে গভীর রাতে যাদের ডাক শোনা যায়।"

সুদীপ্ত বুঝতে পারল, তাশি কী বলতে চাইছে। এই সব পোর্টার-শেরপারা নানা ভূত-প্রেত, অপদেবতায় বিশ্বাস করে। সে তাদের কথাই বোঝাতে চাইছে। সুদীপ্তর এসবে তেমন বিশ্বাস নেই, কিন্তু মনাস্ট্রিটা দেখার লোভে সে তাশিকে বলল, "চলো, তা হলে ওখানে ঘুরেই আসা যাক।"

তাশি যেন বেশ খুশিই হল সেখানে যাওয়ার কথা শুনে। এক ছুটে সে পিছনের তাঁবুতে ঢুকে তার নিজের ব্যাগ হাতড়ে এক গোছা ধূপকাঠি নিয়ে এসে সুদীপ্তকে বলল, "চলুন সাহেব।"

কনকনে ঠান্ডা বাতাসের মধ্যে পাইন বনের দিকে রওনা হল তারা। জায়গাটা সুদীপ্তর যত কাছে মনে হয়েছিল, ঠিক তত কাছে নয়। পাহাড় ভেঙে, বরফগলা জল পেরিয়ে সেই পাইন বনের কাছে পৌঁছতেই আধ ঘণ্টা সময় লেগে গেল।

পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপর দিকে উঠে গিয়েছে বনটা। পায়ের নীচে শতাব্দীর পর-শতাব্দী ধরে জমা হওয়া পচা পাতার স্তূপ। আর মাথার উপর গাছের ডালের গায়ে আটকে থাকা বরফকুচি থেকে টুপটাপ ঝরে পড়া জল, বনটা পার হতে গিয়ে প্রায় ভিজে গেল সুদীপ্তরা। বনের বাইরে বেরিয়ে আসতেই অবশ্য মনাস্ট্রি চত্বরে পৌঁছে গেল তারা।

মনাস্ট্রিটা বেশ প্রাচীন। পাথরের দেওয়াল, মাথায় পাথরের টুকরো বসানো ঢালু ছাদ। তবে অনাদর-অবহেলায় জীর্ণ হয়ে গিয়েছে গুম্ফাটি। পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নেমে আসা হিমেল বাতাস মনাস্ট্রি চত্বর প্লাবিত করে নেমে যাচ্ছে আরও নীচের দিকে। মনাস্ট্রির প্রবেশ-তোরণের মাথায় খোদিত আছে ভীষণদর্শন এক অপদেবতার মূর্তি। তাশি জানাল, এ মঠ নাকি নিয়াগমাপা বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের। এ মঠে নাকি তন্ত্রসাধনা করা হয়।

তোরণ অতিক্রম করে প্রায় অন্ধকার প্রার্থনাকক্ষে প্রবেশ করল তারা দু'জন। ঘরের শেষ প্রান্তে উঁচু বেদির উপর রয়েছে পাথরের তৈরি বেশ বড় পদ্মাসনে ধ্যানস্থ বুদ্ধমূর্তি। তার পাদমূলে ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে। কয়েকজন বৌদ্ধ ভিক্ষু অস্পষ্ট ছায়ামূর্তির মতো ঘুরে বেড়াচ্ছেন সেখানে। তাশির সঙ্গে সুদীপ্ত হাজির হল মূর্তিবেদির সামনে। বেদিটা প্রায় পাঁচ ফুট উঁচু। তার নীচে ধূপের ছাই জমে-জমে যেন একটা ছোট পাহাড় তৈরি হয়েছে।

যুগ-যুগ ধরে কত অভিযাত্রীরা যে অভিযানের সফলতা কামনায় এখানে ধূপ জ্বালিয়েছেন কে জানে? তাঁদের মধ্যে অনেকে হয়তো দেবতার আশীর্বাদে দুর্গম পর্বতমালার মাথায় নিজেদের পদচিহ্ন এঁকে নির্বিঘ্নে ঘরে ফিরেছেন। আবার কেউ হয়তো ফিরতে পারেননি। অজানা, অচেনা তুষারাবৃত কোন পর্বতকন্দরে বরফের পুরু চাদরের নীচে যুগ-যুগ ধরে চিরনিদ্রায় শায়িত থাকবেন তাঁরা। ধূপের স্তূপের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্তর মনে হল এ কথাগুলো।

তাশি ধূপ জ্বালিয়ে ক'টা ধূপ সুদীপ্তকে দিয়ে বাকিগুলো নিজের হাতে বসিয়ে দিল সেই ছাইয়ের স্তূপে। তার দেখাদেখি সুদীপ্তও একটু ঝুঁকে কাজটা করে সোজা হয়ে বেদির সামনে দাঁড়াতেই হঠাৎই একটা জিনিসে চোখ আটকে গেল তার। সুদীপ্তর চোখের সমান্তরালে পদ্মাসনে বসা বুদ্ধমূর্তির কোলে রাখা আছে একটা বিশালাকৃতির খুলি। তার মাথায় কাপড়চাপা দেওয়া থাকলেও তার গঠন দেখে সে যে মানুষ বা তার সমগোত্রীয় কোনও প্রাণীর খুলি, তা বুঝতে অসুবিধে হল না সুদীপ্তর। ঘিয়ের প্রদীপের ম্লান আলোয় সেই করোটিটা তার শূন্য অক্ষিকোটর নিয়ে দাঁত বের করে যেন হাসছে সুদীপ্তর উদ্দেশে।

"ও কার খুলি কোলে নিয়ে বসে আছেন বুদ্ধদেবতা?" সুদীপ্ত তাশিকে প্রশ্নটা করতেই সে শ্রদ্ধাভরে সেই খুলিটার উদ্দেশে প্রণাম জানিয়ে একটু ভয়ার্ত ভাবে বলল, ওটা হল তাদের রাজার মাথা। যারা পাহাড়ে বরফের নীচে টেনে নেয় মানুষকে, যারা পাথরের খাঁজ থেকে আইস-এক্স খুলে ফেলে, দড়ি কেটে দুর্ঘটনা ঘটায়, যাদের সাধারণত চোখে দেখা যায় না, তুষারপ্রান্তরে তাঁবুর বাইরে অন্ধকারে যাদের চিৎকার শোনা যায়...ভূতের রাজার মাথা!

ব্যাপারটা বিশ্বাস না করলেও খুলিটা কৌতূহলের উদ্রেক ঘটাল সুদীপ্তর মনে। অনেকটা মানুষের মাথার মতো দেখতে, কিন্তু মানুষের মাথার খুলিতে দাঁত অত বড় হয় না! তা হলে কীসের খুলি ওটা? সুদীপ্ত খুলিটার দিকে তাকিয়ে বোঝার চেষ্টা করতে লাগল ব্যাপারটা।

তাশি সুদীপ্তর উদ্দেশে বলল, "আপনি খুব ভাগ্যবান বলে মাথাটা দেখতে পেলেন। প্রতি পাঁচ বছরে ধর্মীয় উৎসবের জন্য মাথাটা উপর থেকে এই মঠে ক'দিনের জন্য আনা হয়, তারপর আবার এ জিনিস উপরে রেখে আসা হয়। আমি এর আগে এই মাথাটা একবারই মাত্র দেখেছি।"

"উপরে মানে?"

তাশি জবাব দিল, "উপরে মানে, নন্দাদেবী ক্লাইম্ব রুটে এখান থেকে আরও পাঁচ হাজার ফুট উচ্চতায় 'মিগু গুম্ফা' নামের এক গুম্ফা আছে। আমি সেখানে যাইনি, শুধু নাম শুনেছি। নন্দাদেবীর মাঝপথে এক গ্লেসিয়ার ব্রিজ বেরিয়ে সেখানে যেতে হয়। যারা নন্দাদেবী পিক এক্সপিডিশনে যায়, তারা সেদিকে না গিয়ে উপর দিকে উঠে যায়। আমি ব্রিজটা দূর থেকে দেখেছি। সেই মিগু গুম্ফাতেই মাথাটা রাখা থাকে।"

সুদীপ্ত বলল, "বুঝলাম। কিন্তু মাথাটা আসলে কি প্রাণীর, সেটা এখনও স্পষ্ট হল না। এরকম জিনিস এর আগে আমি কখনও দেখিনি।"

তাশি কী একটা জবাব দিতে যাচ্ছিল, কিন্তু তার আগেই খুব কাছ থেকে ভেসে এল একটা কণ্ঠস্বর, "আমি কিন্তু ওরকম আরও একটা মাথা দেখেছি। সেটা রাখা আছে এই নেপাল হিমালয়েরই খুমজাং মনাস্ট্রিতে।"

সুদীপ্ত মৃদু চমকে উঠে তাকিয়ে দেখল, কিছু দূরে দেওয়ালের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে একজন দীর্ঘকায় লোক। অন্ধকার দেওয়ালের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে বলে তাকে এতক্ষণ খেয়াল করেনি সুদীপ্তরা।

লোকটা এবার কাছে এগিয়ে এসে সুদীপ্তকে বলল, "আমাকে চিনতে পারছেন?"

লোকটা একজন ইউরোপিয়ান। কয়েক মুহূর্ত তার দিকে তাকিয়ে থাকার পর সুদীপ্ত চিনতে পারল লোকটাকে। এখানে আসার পথে কাঠমান্ডুতে এক হোটেলে একদিনের জন্য থাকতে হয়েছিল সুদীপ্তদের টিমটাকে। তখনই হোটেলের লবিতে এ লোকটার সঙ্গে সুদীপ্তর সৌজন্যমূলক পরিচয় হয়েছিল। সুদীপ্তরা কোন পিক এক্সপিডিশনে যাচ্ছে, সে জানতে চেয়েছিল। জার্মানি থেকে এসেছে লোকটা। প্রাণীতত্ত্ববিদ। খুব সামান্যই কথাবার্তা হয়েছিল তার সঙ্গে। কী যেন নাম বলেছিল?

লোকটা এর পর নিজেই করমর্দনের জন্য সুদীপ্তর দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "আমি হেরম্যান। কাঠমাণ্ডুর 'হোটেল স্বয়ম্ভু'তে..."

সুদীপ্তও হেসে তার দিকে হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলল, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমি চিনতে পেরেছি।"

হেরম্যান বললেন, "আমিও দু'দিন আগে এখানে এসেছি। কাল দেখলাম আপনার টিমের সবাই এক্সপিডিশনে বেরিয়ে গেলেন, আপনি গেলেন না?"

সুদীপ্ত জবাব দিল, "না, আমি যাইনি।"

"কেন? শরীর খারাপ হল? নাকি পারমিটের সমস্যা?"

সুদীপ্ত বলল, "না, ও দুটোর কোনওটাই নয়। আসলে রক ক্লাইম্বিংয়ের বেসিক কোর্সটা আমার করা থাকলেও আমি সে অর্থে ঠিক ক্লাইম্বার নই। আমার বন্ধুরা যে এক্সপিডিশনে যাচ্ছে, সে এক্সপিডিশনে একমাত্র দক্ষ পর্বতারোহীরাই অংশ নিতে পারে। আমি ওদের সঙ্গে এ পর্যন্ত এসেছি বেড়ানোর নেশায়। এ পর্যন্ত হিমালয়ের যতটুকু সৌন্দর্য উপভোগ করা যায়, তার জন্য।"

"আপনি কি ক্লাইম্বার?"

হেরম্যান হেসে জবাব দিলেন, "এভারেস্ট বা নন্দাদেবী-ত্রিশূল ক্লাইম্ব করার মতো তেমন দক্ষ নই, তবে আল্পসের দু'-একটা ছোট পিক ক্লাইম্ব করেছি।"

"এখানে কি তা হলে আপনি আমার মতো ভ্রমণের নেশায় এসেছেন?"

মৃদু চুপ করে থেকে হেরম্যান জবাব দিলেন, "এ ব্যাপারে আপনি 'হ্যাঁ' বা 'না' দু'টোই ধরে নিতে পারেন।"

সুদীপ্ত এর পর আগের প্রসঙ্গে ফিরে গিয়ে বলল, "খুমজাং গুম্ফায় এরকম আর একটা মাথার ব্যাপারে আপনি কী যেন বলছিলেন?"

হেরম্যান বললেন, "আপনার এ জায়গা দেখা হয়ে গেলে আমরা বাইরে বেরিয়ে কথা বলতে পারি। ধূপের ধোঁয়ায় আমার অ্যালার্জি আছে। বেশিক্ষণ থাকলে হাঁচি হয়।"

সুদীপ্ত একবার সেই খুলিটার দিকে তাকিয়ে নিয়ে বলল, "হ্যাঁ, চলুন বাইরে যাই।"

মনাস্ট্রির অন্ধকার কক্ষ ছেড়ে বাইরে বেরোতে গিয়ে একটু থমকে দাঁড়িয়ে হেরম্যান কারও উদ্দেশে কী যেন বললেন।

সুদীপ্ত দেখল বেদির কোণ ঘেঁষে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে আছেন একজন লামা আর একজন লম্বা লোক। সেই লম্বা লোকটা জবাব দিল, "এই তো একটু আগে। যাত্রা শুরুর আগে একটু খোঁজখবর নিতে এলাম এই মঠে।"

তার সঙ্গে আর কোনও কথা না বলে বাইরে বেরতে-বেরতে হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "ওঁর নাম বীরবাহাদুর। ফরেস্ট রেঞ্জার। আমি ওঁদের ওখানেই আছি।"

বাইরে পা রাখলেন তাঁরা। নীল আকাশের প্রেক্ষাপটে আপন মহিমায় দাঁড়িয়ে আছে তুষারশুভ্র, কিরীটশোভিত হিমালয়। তা দেখে সুদীপ্ত বলে উঠল, "ভয়ঙ্কর সুন্দর!"

হেরম্যান বললেন, "হিমালয় শুধু ভয়ঙ্কর সুন্দরই নয়, রহস্যময়ও বটে। ওর বরফাবৃত নির্জন প্রান্তরে, অন্ধকার পর্বতকন্দর-পাতালগুহায় কত যে গোপন রহস্য লুকিয়ে আছে কে জানে! অনেকে ওই রহস্যর টানেই হিমালয় অভিযানে যায়।"

সুদীপ্ত বলল, "আপনি নিশ্চয়ই ওই বেসক্যাম্পের ওখানে যাবেন? চলুন, যেতে-যেতে কথা বলি।"

সম্মতি প্রকাশ করে পাইন বনে প্রবেশ করলেন হেরম্যান।

॥ ২ ॥

হেরম্যান হাঁটতে-হাঁটতে বললেন, "হ্যাঁ, যে কথা বলছিলাম, খুমজাং মনাস্ট্রিতে আমি ঠিক ওরকম একটা খুলি দেখেছি। শুনেছি, হিমালয়ের প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতেও ওরকম আরও একটা মাথা রাখা আছে। খুলিটা কাপড়চাপা অবস্থায় আছে বলে আপনি হয়তো বুঝতে পারেননি যে, ওর মাথায় রোমশ চামড়ার আবরণ আছে।"

সুদীপ্ত বলল, "কিন্তু খুলিটা আসলে কোন প্রাণীর?"

চলতে-চলতে হঠাৎ থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। তারপর বেশ রহস্যময় ভাবে বললেন, "পাহাড়ি লোকরা তো বলে এ হল সেই প্রাণীর খুলি, পর্বত অভিযানে গিয়ে কেউ-কেউ যার পায়ের ছাপ দেখে ফেলেন।"

হেরম্যানের কথার ইঙ্গিতটা ধরতে পেরে সুদীপ্ত চমকে উঠে বলল, "অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান? ইয়েতি?"

তিনি আবার হাঁটতে-হাঁটতে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, মনাস্ট্রির লোকজন সেরকমই দাবি করে। তবে এ নিয়ে বিভিন্নরকম মত আছে।"

"কীরকম?"

হেরম্যান বললেন, "আপনি হয়তো জানেন যে, ওই প্রাণীর খোঁজে বহুবার হিমালয় অভিযান হয়েছে। এমনকী, হিলারি, তেনজিং-এর মতো প্রণম্য এভারেস্ট জয়ীরাও তার কয়েকটিতে অংশ নেন। ইয়েতির সন্ধানে সবচেয়ে বড় অভিযান হয় 'ডেলি মেল' নামক এক খবরের কাগজের অর্থানুকূল্যে ১৯৫৪ সালে। এভারেস্ট থেকে কাঞ্চনজঙ্ঘা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে সে অভিযান চালানো হয় জন জ্যাকসনের নেতৃত্বে। তার সহকারী ছিলেন বাঙালি প্রাণীবিদ বিশ্বময় বিশ্বাস। সে অভিযানের রিপোর্ট বের হয় ওই বছরই। তাতে বলা হয়, প্যাংবোচে মনাস্ট্রিতে ওরকম এক খুলির সন্ধান পান তাঁরা। সেটার থেকে কয়েকটা লোম বা চুল সংগ্রহ করেন তাঁরা। সেই চুল পরীক্ষা করেন পৃথিবীবিখ্যাত শরীরসংস্থানবিদ প্রোফেসর ফ্রেডরিক উড জোন্‌স। কিন্তু বিভিন্ন প্রাণীর চুলের সঙ্গে সে নমুনা মিলিয়েও ওটা ঠিক কী প্রাণীর লোম, সে ব্যাপারে সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি তিনি। আধুনিক পৃথিবীর জীববিজ্ঞানীরাও পরিচিত কোনও জীবের সঙ্গে সে প্রাণীর মিল পাননি। এবার আসি আমি খুমজাং মনাস্ট্রির খুলিটার কথায়, যেটা আমি দেখেছি। ১৯৬০ সালে হিলারি ইয়েতির সন্ধানে অভিযানে গিয়ে ওই খুমজাং গুম্ফায় যান। সেখানে সেসময় ওরকম একাধিক খুলি রাখা ছিল। তারই একটা জোগাড় করে তিনি বিখ্যাত কয়েকজন জীববিজ্ঞানীর কাছে পাঠিয়েছিলেন গবেষণার জন্য। কয়েকজন জীববিজ্ঞানী বলেন, ওটা নাকি মেরো নামে এক ধরনের হরিণের হাড় ও চামড়া দিয়ে তৈরি করা লোক ঠকানোর জিনিস। কিন্তু ম্যায়রা শ্যাকলের মতো বিখ্যাত জীববিজ্ঞানী ওই তত্ত্ব নাকচ করে দিয়ে বলেন, ওটা কখনওই মেরোর হতে পারে না। কারণ, ওই চুলগুলো বাঁদরের চুলের মতো, আর ওই চামড়া-হাড়ে এমন কিছু পরজীবী পোকা পাওয়া গিয়েছে, যা মেরোর চামড়ায় কোনও অবস্থাতেই থাকতে পারে না," একটানা কথাগুলো বলে থামলেন ভদ্রলোক।

সুদীপ্ত বেশ চমৎকৃত হয়ে বলল, "আপনি তো এ ব্যাপারে অনেক খবর রাখেন দেখছি!"

হেরম্যান মুচকি হেসে বললেন, "হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমার বিশেষ আগ্রহ আছে। আপনি যে অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান কথাটা বললেন, এই শব্দবন্ধের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছিল জানেন?"

"অ্যাবোমিনেব্‌ল স্নোম্যান বা ঘৃণ্য তুষারমানব কথাটা জানা থাকলেও কথাটার উৎস জানা নেই," মাথা নাড়ল সুদীপ্ত।

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে বলি। ১৯২১ সালে লেফটেন্যান্ট কর্নেল চার্লস হাওয়ার্ড বেরির নেতৃত্বে 'এভারেস্ট রিকনয়সেন্স' বলে এক অভিযান হয়। ওই অভিযানে ২১ হাজার ফুট উচ্চতায় 'লাকপা-লা' গিরিবর্ত্মে দোপেয়ে মানুষের নগ্ন পদচিহ্নর মতো বড় পদচিহ্ন দেখতে পান চার্লস। সেই ছাপগুলো এঁকেবেঁকে হারিয়ে গিয়েছিল গিরিবর্ত্মের এক অগম্য প্রান্তে। ওই ছাপটা সম্বন্ধে চার্লসের সঙ্গী শেরপারা জানায়, ওটা হল তাদের ভাষায় 'মেটোহ্ কাংগমি' অর্থাৎ বুনো মানুষের পায়ের ছাপ। ওই অভিযান শেষে ফিরে আসার পর শেরপাদের একটা ইন্টারভিউ নেন কলকাতার এক বিখ্যাত ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক কিম। তিনি শেরপাদের বলা 'মেটোহ্' শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করতে না পেরে তাঁর কলামে শব্দটার অর্থ করেন অ্যাবোমিনেবল স্নোম্যান, নোংরা বা ঘৃণ্য তুষারমানব। খবরের কাগজের দৌলতে শব্দটা পরিচিতি লাভ করে।"

সুদীপ্ত হেরম্যানের বক্তব্য যত শুনছে, ততই যেন আগ্রহ বাড়ছে তাঁর প্রতি। লোকটার বেশ পড়াশোনা আছে। বাচনভঙ্গিও বেশ সুন্দর। সে জানতে চাইল, "আপনার কী ধারণা? হিমালয়ের গভীরে ইয়েতি বা ও ধরনের প্রাণীর অস্তিত্ব কি আছে?"

হেরম্যান সুদীপ্তর দিকে তাকিয়ে অনুচ্চ অথচ বেশ দৃঢ় ভাবেই যেন বললেন, "হ্যাঁ, আমার ধারণা, আছে। এত লোক এত ভাবে মিথ্যা বলতে পারে না।"

জবাব দিয়ে হেরম্যান আর কোনও কথা বললেন না। গম্ভীর ভাবে কী যেন ভাবতে লাগলেন।

সুদীপ্তরা একসময় ফিরে এলেন তার ডেরার কাছে। সুদীপ্ত হেরম্যানকে বলল, "একটু চা খেয়ে যান?"

লোকটা সুদীপ্তর প্রস্তাবে বেশ খুশি হয়ে বলল, "হ্যাঁ, একটু চা পেলে মন্দ হয় না। আমি আস্তানা গেড়েছি ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের দলটা যেখানে আছে। এ পাহাড়ি অঞ্চলে জঙ্গল না থাকলেও বন্যপ্রাণী রক্ষণাবেক্ষণের কাজ নাকি ওরাই করে।"

তাশি তাঁবু থেকে স্পিরিট, স্টোভ আর সরঞ্জাম বের করে কিছু দূরে চা করতে বসল। আর সুদীপ্তরা বসল তাঁবুর সামনে একটা পাথরের উপর। বসার পর সুদীপ্ত একটু ইতস্তত করে বলল, "আপনার এখানে আসার কারণটা আমার এখনও জানা হয়নি। আপত্তি না থাকলে বলবেন?"

হেরম্যান তাকে পালটা একটা প্রশ্ন করলেন, "আপনি ক্রিপ্টোজুলজিস্ট কাদের বলে জানেন?"

সুদীপ্ত বলল, "না শুনিনি। তবে শব্দটা শুনে বুঝতে পারছি, সম্ভবত তাঁরা প্রাণীবিষয়ক কোনও কিছুর চর্চা করেন।"

হেরম্যান মুচকি হেসে বললেন, 'হ্যাঁ, প্রাণীবিষয়ক চর্চা তো বটেই। তবে একটু অন্য ধরনের। ব্যাপারটা তবে একটু খোলসা করি। বিজ্ঞানী হুভেলম্যান হলেন এই শব্দের জনক। ক্রিপ্টোজুলজি শব্দের অর্থ হল 'ধাঁধা জীববিদ্যা'। এই পৃথিবীতে আমাদের পরিচিত প্রাণীকুলের বাইরেও বিভিন্ন লোককথা-উপকথায় এমন অনেক প্রাণীর কথা শোনা যায়, যাদের মানুষ কল্পলোকের প্রাণী বলে ভাবে। অথবা এমন কোনও প্রাণী যারা লক্ষ-কোটি বছর আগে পৃথিবী থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছে বলে আধুনিক পৃথিবীর ধারণা। এসব প্রাণীকে বলে ক্রিপটিড, আর যাঁরা তাদের নিয়ে চর্চা করেন তাঁদের বলা হয় ক্রিপ্টোজুলজিস্ট।"

"চর্চা মানে?"

"চর্চা মানে অনুসন্ধান। তাঁরা খুঁজে বেড়ান ওই সব গল্পকথার প্রাণীদের। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কথা শুনলে একসময় নাক সিঁটকাতেন ঘরে বসে পুঁথিপড়া পণ্ডিত বিজ্ঞানীরা। তাঁরা বিশ্বাসই করতেন না ক্রিপটিডদের অস্তিত্ব। ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের তাঁরা শঠ-ধাপ্পাবাজ-প্রবঞ্চক বলতেন। রূপকথার প্রাণী বা কোটি বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া প্রাণীর বাস্তবে অস্তিত্ব থাকতে পারে নাকি? হ্যাঁ, পারে এবং তা প্রমাণ করে দেখিয়েছেন ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা। পুঁথি পড়ে নয়, সামান্য লোককথা বা জনশ্রুতিকে সম্বল করে নিজেদের জীবনকে বাজি রেখে তাঁরা প্রমাণ করেছেন ক্রিপটিডদের।"

"কীরকম?"

"দু'-একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কার হবে। যেমন ইন্দোনেশিয়ার সুন্দা দ্বীপমালার ধীবররা বলতেন যে, সে দেশের কোনও-কোনও দ্বীপে নাকি এখনও জীবন্ত ড্রাগনের দেখা মেলে। প্রচলিত বিজ্ঞান শিক্ষায় শিক্ষিত জীববিজ্ঞানীরা তখন এ ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করতেন। কিন্তু ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা বারবার বলতেন, ও প্রাণীর অস্তিত্ব আছে। নিরক্ষর ধীবর বলে তাঁদের কথা অবিশ্বাস করা উচিত নয়। শেষ পর্যন্ত কিন্তু সত্যি খোঁজ পাওয়া গেল কোমোডো ড্রাগনকে। আবার ধরুন, সমুদ্র অভিযানে যাওয়া অনেক মানুষ এক দানবীয় স্কুইডের কথা বলতেন, যারা ছোটখাটো নৌকো তার শুঁড়ে পেঁচিয়ে ডুবিয়ে দিতে পারে। বিজ্ঞানীরা মানতেন না ব্যাপারটা। কিন্তু ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের উদ্যোগে জাপানের ন্যাশনাল সায়েন্স মিউজিয়াম সমুদ্রের গভীরে অভিযান চালিয়ে তুলে আনলেন জায়েন্ট স্কুইডের মুভিফোটো। অথবা ৪৯ কোটি বছর আগের জীবাশ্মে দেখা সেই সিলিকান্থ মাছ। পুঁথি পড়া বিজ্ঞানীদের যাবতীয় ভাবনায় জল ঢেলে ১৯৩৮ সালে ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা প্রমাণ করলেন, সে মাছ আছে।

কোমোরোস দ্বীপের ধীবররা ও মাছকে 'গামবোসা' বলেন। তার খসখসে চামড়া দিয়ে তাঁরা দীর্ঘদিন শিরীষ কাগজের কাজ চালিয়ে আসছেন, অথচ সভ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা জানতেনই না ব্যাপারটা। বুঝুন তাঁদের কাণ্ডটা! তাসমানিয়ার ডিমপাড়া স্তন্যপায়ী প্রাণী প্লাটিপাস, সমুদ্রের দানব হাঙর মেগামাউথ শার্ক বা ইন্দোনেশিয়ার ফ্লোরেস দ্বীপের ডোয়ার্ফম্যান, এ সবই কিন্তু একসময় ক্রিপটিড বা রূপকথার প্রাণী হিসেবে চিহ্নিত হত। কিন্তু এই প্রতিটা ক্ষেত্রেই শেষ হাসি হেসেছেন ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা। তাঁরা প্রমাণ করেছেন, পৃথিবীতে এসব প্রাণীর অস্তিত্ব আছে বা একদিন ছিল।"

সুদীপ্ত হেরম্যানের কথা অবাক হয়ে শুনতে-শুনতে প্রশ্ন করল, "ওরকম কী-কী ক্রিপটিডের সন্ধান এখনও চলছে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে এখনও নানা প্রাণী উপস্থিতির কথা শোনা যায়, যাদের সভ্য পৃথিবী চোখে দ্যাখেনি। কিন্তু দৈবাৎ কোনও-কোনও মানুষ তাদের চোখে দেখেছেন বা তাদের উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েছেন। এই সব ক্রিপটিডের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল, ইন্দোনেশিয়ার জঙ্গলের উভুক্কু ডাইনোসর 'আ-হুল', অস্ট্রেলিয়ার লেক নেসির লম্বা গলার জলদানব, আমেরিকার বিগফুট, মালয়ের রাবার বনের লোমওলা বানর-মানুষ, মাদাগাস্কারের মানুষখেকো গাছ আর...

তাশি চা করে আনল। ছেদ পড়ল হেরম্যানের বক্তব্যে। কথা থামিয়ে তৃপ্তি সহকারে চায়ের মগে চুমুক দিতে লাগলেন তিনি। সুদীপ্তও চায়ে চুমুক দিয়ে এই সুযোগে ভাল করে দেখতে লাগল হেরম্যানকে। হেরম্যান মাঝবয়সি, শরীরের গঠন বেশ শক্তপোক্ত। দড়ির মতো হাতের চামড়ার গায়ে জেগে থাকা শিরা-উপশিরাগুলো যেন তাঁর কাঠিন্যর, পরিশ্রমের সাক্ষ্য দিচ্ছে। মাথায় সোনালি চুল, নীল চোখ। গায়ের রং একসময় খুব সাদাই ছিল। কিন্তু রোদে পুড়ে সেই রং এখন তামাটে বর্ণ ধারণ করেছে।

চা শেষ করে হেরম্যান সুদীপ্তকে ধন্যবাদ জানিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, কী যেন বলছিলাম?"

সুদীপ্ত বলল, "ওই ক্রিপটিডদের কথা। আচ্ছা, ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা তাঁদের কাজের বিনিময়ে কী পান?"

হেরম্যান হেসে বললেন, "আপনি অর্থানুকুল্য বা খ্যাতির কথা বলছেন? ওসব কিছুই তাঁদের ভাগ্যে জোটে না। বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাঁদের কপালে ব্যঙ্গবিদ্রুপই জোটে। ক্রিপ্টোজুলজিস্টরা কাজটা পুরস্কার বা খ্যাতির জন্য করেন না, করেন নতুনকে জানার নেশায়, আত্মতৃপ্তির জন্য। নিজেদের সর্বস্ব পণ করে তাঁরা ঘুরে বেড়ান ক্রিপটিডের খোঁজে। এই যেমন আমি, নিজের দেশে ইমপোর্ট-এক্সপোর্টের ব্যবসা বেচে দিয়ে পৃথিবীর এ মাথা, ও মাথায় পাহাড়-জঙ্গলে ঘুরে বেড়াই ক্রিপটিডের খোঁজে।"

তাঁর এই শেষ কথাগুলো শুনে বিস্মিত সুদীপ্ত বলে উঠল, "আপনিও তা হলে ক্রিপ্টোজুলজিস্ট?"

মৃদু হেসে সম্মতিসূচক মাথা নাড়লেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত এর পর প্রশ্ন করল, "আপনি কি তা হলে এখানে কোনও ক্রিপটিড খুঁজতে এসেছেন? কী সেটা?"

প্রশ্নটা শুনে হেরম্যান বেশ কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন দূরের তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গের দিকে। তারপর বেশ শান্ত গলায় জবাব দিলেন, "হ্যাঁ। আমি এখানে খুঁজতে এসেছি পৃথিবীর সবচেয়ে রহস্যময় প্রাণী, ক্রিপটিড জগতের মহানায়ক ইয়েতিকে। যার প্রসঙ্গে আলোচনার সূত্র ধরে আমাদের এত কথা হল।"

"ইয়েতি! তার মানে গুম্ফায় যে খুলিটা রাখা আছে, সেটাকে আপনি সত্যি বলে মনে করেন?"

"ওটা সত্যি কিনা আমি বলতে পারছি না, তবে যে গুম্ফায় ওই খুলিটা আসলে রাখা থাকে, সেই মিগু গুম্ফাকে কেন্দ্র করে বেশ কয়েকটা রহস্যময় খবর কিন্তু লোকমুখে প্রচারিত আছে। আচ্ছা, আপনি 'মিগু' শব্দের অর্থ জানেন?"

সুদীপ্ত জবাব দিল, "না, জানি না।"

তিনি বললেন, "তিব্বতি ভাষায় মিগু শব্দের অর্থ হল বরফের বুনো মানুষ অর্থাৎ ইয়েতি।"

এই বলে একটু থেমে তিনি এর পর বললেন, "এখানকার গুম্ফা থেকে ওই খুলিটা আগামী কাল মিগু গুম্ফায় নিয়ে যাওয়া হবে বলে শুনলাম। আমিও কাল রওনা হব মিগু গুম্ফার উদ্দেশে। আমি ওই গুম্ফাটা একবার দেখতে চাই। ওখানকার মঠাধ্যক্ষ নাকি একজন দৃষ্টিহীন ভদ্রলোক। দেখি, ওখানে পৌঁছে যদি ভদ্রলোকের কাছ থেকে কোনও তথ্য সংগ্রহ করা যায়। ওই সরকারি দলটা কালই রওনা হচ্ছে তুষার চিতার খোঁজে। দলটার নেতা রেঞ্জার বীরবাহাদুর ছেত্রীর সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছে। আমি ওদের পিছনে যাব। মিগু গুম্ফা এখান থেকে দু' দিনের পথ।"

"আপনি আমাকে আপনার সঙ্গে নেবেন?" সুদীপ্ত হালকা চালেই প্রশ্নটা করেছিল হেরম্যানকে। কিন্তু কথাটা সত্যি ধরে নিয়ে প্রবল আগ্রহের সঙ্গে তিনি বললেন, "আপনি সত্যিই যেতে চান আমার সঙ্গে! আমিও একজন সঙ্গী খুঁজছিলাম। এই মুহূর্তে আমার কাছে এর চেয়ে ভাল প্রস্তাব হতে পারে না! আমি অবশ্যই আপনাকে সঙ্গে নেব। চিন্তার কিছু নেই, আট-দশ দিনের মধ্যেই ফিরে আসব। আর যাবতীয় খরচ আমিই বহন করব।"

সুদীপ্ত এবার একটু থতমত খেয়ে গেল। সুদীপ্তর বন্ধুরা এক্সপিডিশন থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত তার হাতে হেরম্যানের সঙ্গে ঘুরে আসার সময় আছে ঠিকই, এ কথাও ঠিক যে, এই হেরম্যান বলে লোকটা আর তাঁর অভিযানের ব্যাপারটা তাকে প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করেছে, কিন্তু এরকম স্বল্পপরিচিত লোকের সঙ্গে বেরনো কি ঠিক হবে? যদি পুরো ব্যাপারটাই ধাপ্পা হয়? লোকটার যদি তাকে সঙ্গে নেওয়ার পিছনে অন্য কোনও উদ্দেশ্য কাজ করে? যদি কোনও বিপদ...

ধন্দে পড়ে পাশ কাটানোর জন্য সুদীপ্ত বলল, "আপনার সঙ্গে যেতে পারলে ভাল হত ঠিকই, কিন্তু আমি তো ভাল মাউন্টেনিয়ার নই। আমাকে নিয়ে যদি আপনার বিপদ ঘটে।"

হেরম্যান বললেন, "আমরা যেখানে যাব, সেখানে পৌঁছনোর জন্য দক্ষ মাউন্টেনিয়ার হওয়ার প্রয়োজন নেই। মাউন্টেনিয়ারিং-এর প্রাথমিক জ্ঞান থাকলেই চলবে। সেটা তো আপনার আছেই। তবে হ্যাঁ, ঝুঁকি বা বিপদের ব্যাপারটা তো যে-কোনও অভিযানেই...," হেরম্যান তাঁর কথা শেষ করতে পারলেন না, হঠাৎ সুদীপ্তর কানে মুহূর্তের জন্য প্রচণ্ড একটা শব্দ ধরা দিল। আর তার পরমুহূর্তেই হেরম্যান উঠে দাঁড়িয়ে এক হ্যাঁচকা টানে সুদীপ্তকে একপাশে সরিয়ে দিলেন। পরমুহূর্তেই বেশ বড় একটা পাথরের খণ্ড সুদীপ্তর গা ঘেঁষে বেরিয়ে একটু এগিয়ে আটকে গেল কিছু দূরে। একটু ধাতস্থ হয়ে সুদীপ্ত বুঝল ব্যাপারটা। সুদীপ্তরা যেখানে বসে ছিল, ঠিক তার পিছনেই কিছুটা উপর দিকে এক জায়গায় বেশ কিছু বড়-বড় পাথরের চাঁই রাখা আছে। সম্ভবত তাঁবুর দড়ি বাঁধার জন্য ওই পাথরগুলো জড়ো করা হয়েছিল। তারই একটা কোনও ভাবে খসে পড়েছে উপর থেকে। হেরম্যানের সতর্ক চোখ না থাকলে সুদীপ্তর বিপদ অনিবার্য ছিল। সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে পাথরটার দিকে তাকিয়ে রইল। অত বড় পাথর যদি সত্যিই তার গায়ে পড়ত, কী অবস্থা হত তার!

হেরম্যান এবার সুদীপ্তর কাঁধে হাত রেখে মৃদু হেসে বললেন, "দেখলেন তো, বিপদ যে-কোনও জায়গায় যে-কোনও মুহূর্তেই নেমে আসতে পারে, আবার মানুষ বিপদ কাটিয়েও ওঠে। ঠিক যেমন আপনার বিপদ কেটে গেল, কাজেই বিপদ নিয়ে বেশি ভাবলে চলে না। সাহস আর ইচ্ছেশক্তি থাকলে বিপদ কেটে যায়।"

হেরম্যানের কথা শুনে সুদীপ্ত কয়েক মুহূর্ত তাঁর চোখের দিকে চুপ করে তাকিয়ে থাকার পর বলল, "আমি কাল আপনার সঙ্গে মিগু গুম্ফায় রওনা দিচ্ছি। আমরা সে ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করব।"

॥ ৩ ॥

যেদিকে চোখ যায় শুধু পাহাড় আর পাহাড়। মাঝে কোথাও-কোথাও হঠাৎ হয়তো চোখে পড়ছে, একখণ্ড পাইন অথবা ফারের

জঙ্গল। বরফের সাদা চাদরের মাঝে ওই বনগুলোকে মনে হচ্ছে সবুজ রঙের কল্কা। মাথার উপর মেঘমুক্ত নীল আকাশের চাঁদোয়া, তবে আকাশে কোনও পাখি নেই, এত উপরে তারা আসে না। গিরিশিরা ধরে এগোচ্ছে সুদীপ্তরা। তাদের কিছুটা আগে এগোচ্ছে তুষারচিতার খোঁজে চলা সেই দলটা। তাঁদের পায়ের ছাপ আঁকা হয়ে থাকছে বরফের বুকে। তার উপর দিয়েই এগোচ্ছেন সুদীপ্ত আর হেরম্যান। যাত্রাপথের দু' ধারে অতলান্ত খাদ। মেঘের দল সুদীপ্তদের পায়ের নীচে ওই খাদগুলোর উপর ভেসে বেড়াচ্ছে। অদ্ভুত লাগছে দেখতে, মাঝে-মাঝে একখণ্ড ধূসর ছোপের মতো নীচের বেসক্যাম্পটাও চোখে পড়ছে। হেরম্যানের হাতে একটা দূরবিন। মাঝে-মাঝে থমকে দাঁড়িয়ে তিনি সেটা দিয়ে চারপাশ দেখছেন। একসময় হঠাৎ তিনি মাটির দিকে সুদীপ্তর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "ওই দেখুন ওই ছাপগুলো।"

মাউন্টেনিয়ারদের পায়ের ছাপের পাশেই আঁকা হয়ে আছে বেশ কিছু খালি পায়ের ছাপ। পায়ের বুড়ো আঙুলগুলো স্পষ্ট বোঝা যাচ্ছে, তবে ছাপগুলো ইয়েতির মতো বিশালাকার প্রাণীর পায়ের ছাপ নয়, মানুষেরই পায়ের ছাপ। সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে বলল, "মাউন্টেনিয়ারদের মধ্যে কেউ খালি পায়ে হাঁটছেন নাকি? অদ্ভুত ব্যাপার তো!"

হেরম্যান বললেন, "না, মাউন্টেনিয়ার নয়, তাঁদেরও আগে যাচ্ছেন ওঁরা। খুলিটাকে ওঁরা মিগু গুম্ফায় ফিরিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন। দু'জন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী। গতকালই তাঁরা বেসক্যাম্পে নেমেছিলেন, আজই আবার ফিরে যাচ্ছেন। আমি ওঁদের দেখতে পাচ্ছি মাঝে-মাঝে।"

এ কথা বলে তিনি যাত্রাপথের অগ্রবর্তী অংশে আঙুল তুলে দেখিয়ে দূরবিনটা সুদীপ্তকে ধরিয়ে দিলেন। সুদীপ্ত দূরবিন চোখে লাগিয়ে একটু এপাশ-ওপাশ দেখতেই হঠাৎ দেখতে পেল তুষারাবৃত পাহাড়ের ঢালে দুটো লাল বিন্দু। লাল পোশাকপরা বৌদ্ধ সন্ন্যাসী দু'জনকে এত দূর থেকে বিন্দুর মতোই লাগছে। সম্ভবত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠছেন তাঁরা।

হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "এই বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের নাকি অনেক অদ্ভুত ক্ষমতা থাকে। এই ঠান্ডায় খালি পায়ে বরফের উপর দিয়ে হাঁটা তারই একটা নিদর্শন। আমি শুনেছি, কোনও-কোনও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী নাকি যোগবলে নিজের দেহে টেম্পারেচার জেনারেট করতে পারেন। এ ব্যাপারটাকে বলে 'তিউমা।' শীত কাবু করতে পারে না তাঁদের।"

সুদীপ্ত বলল, "আমিও ওরকম বেশ কিছু গল্প শুনেছি ওঁদের সম্পর্কে। কোনও একটা বইয়ে যেন পড়েছিলাম যে, হিমালয়ের তান্ত্রিক বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা নাকি পদ্মাসনে ধ্যানস্থ অবস্থায় শূন্যমার্গে বিচরণ করতে পারেন। কেউ-কেউ আবার নাকি মঠের অন্ধকার কুঠুরিতে বসেই তাঁর অতীন্দ্রিয় ক্ষমতার মাধ্যমে বলে দিতে পারেন পাহাড়ের কোথায় কী ঘটনা ঘটছে। আচ্ছা, আমরা যে মিগু মঠে যাচ্ছি, সেখানেও কি এরকম কোনও অবিশ্বাস্য ব্যাপার দর্শন করার সম্ভাবনা আছে?"

হেরম্যান বললেন, "সেটা ওখানে না পৌঁছনো পর্যন্ত ঠিক বলা যাবে না। তবে ও জায়গাটা সম্পর্কে যতটুকু শুনেছি, তাতে ওই মঠটাকে বেশ রহস্যময় বলেই মনে হয়েছে। তুষারাবৃত এক জনহীন প্রান্তরে একলা দাঁড়িয়ে আছে কয়েকশো বছরের প্রাচীন ওই গুম্ফা। তিন-চারজন বৌদ্ধ সন্ন্যাসী ওখানে থাকেন। বেশ কয়েকটা তুষারচিতা নাকি রয়েছে ওই মঠে। মঠের লোকেরা নাকি কুকুরের মতো তাদের [redacted]

ছেলে। পড়ে গেলেও ভাগ্য ভাল ছিল তার। ছেলেটার পিঠের ব্যাগটার একটা অংশ খাদের গায়ে একটা বুনো গাছের ডালে আটকে যায়। উপর থেকে তার সঙ্গীরা তাকে দেখতে পাচ্ছিল না। পড়ার সময় ফ্রেডরিক অজ্ঞান হয়ে যায়। উপর থেকে হাঁকডাক করে তার সন্ধান না মেলায় অন্যরা অভিযান স্থগিত বেসক্যাম্পের দিকে ফিরতে শুরু করে। ফ্রেডরিক পড়ার মুহূর্তে অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিল। জ্ঞান ফিরেই সে দেখতে পায়, সে গাছের ডালে ঝুলছে। ফ্রেডরিক তখন বাঁচার জন্য চিৎকার শুরু করে, কিন্তু ততক্ষণে তার সঙ্গীরা বেসক্যাম্পের দিকে রওনা হয়েছে। ফ্রেডরিক যেখানে ঝুলছিল, তার হাতখানেক তফাতেই একটা পাথরের তাক আর তার উপরেই একটা গুহামুখ। ফ্রেডরিক যদি তাকটার কাছে পৌঁছতে পারে, তবে বেঁচে যায়। কিন্তু ওই ঝুলন্ত অবস্থায় বেশ কিছুক্ষণ তাকটার কাছে পৌঁছবার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয় সে। ক্লান্তি আর অবসাদে এর পর হাল ছেড়ে দিয়ে নিজেকে ভাগ্যের উপর সঁপে দিয়ে ওভাবেই ঝুলতে থাকে সে। এদিকে তখন পাহাড়ে অন্ধকার নামতে শুরু করেছে। কতক্ষণ ফ্রেডরিক ওভাবে ঝুলছিল খেয়াল ছিল না তার। ভবিতব্য বুঝতে পেরে তার চোখ বন্ধ হয়ে এসেছিল। একসময় হঠাৎ তার মনে হয়, তাকে ধরে কে যেন ঝাঁকাচ্ছে। চোখ খুলতেই সে দেখতে পায়, সে তাকে পৌঁছে গিয়েছে। কীভাবে সে পৌঁছল? আর তখনই সে খেয়াল করে, কে যেন পিছন থেকে ধরে রেখেছে তার কোমরটা! মানুষের অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দও যেন তার কানে আসে। তা হলে কি কোনও উদ্ধারকারী দল এসেছে তাকে বাঁচাতে? তার সঙ্গীরা? সে তার উদ্ধারকারীকে দেখার জন্য পিছনে তাকাতেই দেখতে পায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। একটা বিরাট বড় রোমশ হাত তাকের গায়ের গহ্বর থেকে বেরিয়ে ধরে রেখেছে তার কোমরটা! চাঁদের আলোয় সে স্পষ্ট দেখতে পায় সেই হাত। অজানা আতঙ্কে চিৎকার করে ওঠে ফ্রেডরিক। হাতটাও সঙ্গে-সঙ্গে তাকে ছেড়ে দিয়ে অদৃশ্য হয়ে যায় গহ্বরের ভিতর। ফ্রেডরিক আবারও সংজ্ঞা হারায় এর পর। তার যখন জ্ঞান ফেরে, তখন সে মিগু গুম্ফায়। সে এই ব্যাপারটা মঠের লোকদের জানালে তাঁরা বলেন যে, সে ওসব ভুল দেখেছে। মঠের লোকেরাই নাকি তাকে ঝুলন্ত গাছ থেকে উদ্ধার করেছেন। পরদিন মঠের লোকেরাই তাকে বেসক্যাম্পে নামিয়ে দিয়ে যান। তবে সেখান থেকে ফেরার সময় ফ্রেডরিক বলে ছেলেটা নিজের অজান্তেই একটা জিনিস সঙ্গে করে এনেছিল। তা হল তার কোমরবন্ধ আর পোশাকের খাঁজে আটকে থাকা কয়েকটা ধূসর লোম। ওই লোমগুলোর ডি এন এ অ্যানালিসিস বলছে, লোমগুলো বানর জাতীয় কোনও প্রাণীর, তবে তা পরিচিত কোনও প্রজাতির নয়।"

একটা গিরিশিরার শেষ মাথায় পৌঁছে গিয়েছে সুদীপ্তরা। পিছল বরফে পা রেখে এবার নীচে নামতে হবে কিছুটা। সে জায়গাটা সাবধানে অতিক্রম করার পর তিনি আবার শুরু করলেন, "এবার দ্বিতীয় ঘটনাটা বলি। সেটাকে প্রায় সাম্প্রতিকই বলা যায়। মাত্র মাস দুই আগের। নেপালের একটা ইংরেজি দৈনিকে সে খবর প্রকাশিত হয়। আমি ইন্টারনেট সংস্করণে খবরটা দেখেছি। আপনি তো নিশ্চয়ই জানেন যে, মাঝে-মাঝে হিমালয়ে সাফাই অভিযান হয়, অর্থাৎ এক্সপিডিশনে গিয়ে পর্বতারোহীরা যা ফেলে আসেন, বিশেষত খাবারের টিন, প্যাকেট বা পর্বতারোহণের কোনও জিনিস, বেশ কিছু সংস্থা সেসব পরিষ্কার করে।"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ জানি।"

হেরম্যান বললেন, "ত্রিশূলের থার্ড পিকে ওরকমই একটা এন জি [redacted]

অনেক বড় বলেই রাইয়ের অনুমান। প্রাণীটাকে দেখার সঙ্গে-সঙ্গে কৌতূহলবশত তিনি কপ্টারটাকে আরও কিছুটা নীচে নামাবার চেষ্টা করেন। আর সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীটা তুষারপাতের মধ্যে বেশ কয়েকটা লম্বা লাফে বরফের প্রাঙ্গণ পেরিয়ে ওই মঠের ভিতর অদৃশ্য হয়ে যায়। এ ঘটনা দেখে বেসক্যাম্পে ফেরার পর ভদ্রলোক গোটা ব্যাপারটা তাঁর উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে রিপোর্ট করেন। কিন্তু তাঁরা ব্যাপারটাকে গুরুত্ব তো দেনই-নি, বরং তাঁর দৃষ্টিশক্তির ও মানসিক সমস্যা আছে বলে তাঁকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করেছেন। রাই বলে ওই ভদ্রলোক প্রথম জীবনে মাউন্টেনিয়ার ছিলেন। কাজ হারিয়ে তিনি এখন পুরনো অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে বনদফতরের এক বিশেষ কাজে নিয়োজিত হয়েছেন। তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি। তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস, তিনি ওই অতিমানব প্রাণীটাকে স্পষ্ট দেখেছেন!"

সুদীপ্ত বিস্মিত ভাবে বলল, "এত খবর আপনি সংগ্রহ করলেন কীভাবে? আর ওই রাই বলে ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচয়ই বা হল কোথায়?"

হেরম্যান হেসে বললেন, "এসব খবর সংগ্রহ করার জন্য ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের ভাড়া করা এজেন্ট থাকে। তাঁরা বিভিন্ন স্থানীয় সংবাদ সংস্থার থেকে খবর সংগ্রহ করে আমাদের দেন। আর ফ্লাইট ক্যাপ্টেন রাইয়ের সঙ্গে আমার পরিচয় হয় এখানে এসে। ওই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের টিমটার সঙ্গেই উনি আছেন। লোকটি নাকি শিকারিও। তবে আমার আসল পরিচয় কিন্তু আমি কাউকে বলিনি। আমি রাইকে বলেছি, আমি হিমালয়ের বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের জীবনযাত্রা, ধর্মদর্শন সম্বন্ধে আগ্রহী। ও নিয়ে একটা বই লেখার জন্য এখানে এসেছি। বীরবাহাদুরও একই কথা জানেন।"

সুদীপ্ত বলল, "মিগু মঠেও কি আপনি ওই পরিচয় দেবেন? আর আমার পরিচয় কী হবে? যদি ধরা পড়ে যান?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, ওই পরিচয়ই দেব। নইলে হয়তো মঠে আমরা ঢুকতেই পারব না। আমার মঠে ঢোকার ক্ষেত্রে অন্য কোনও অসৎ উদ্দেশ্য নেই। আমি এসেছি সত্য অনুসন্ধানে। তেমন মনে হলে সত্যিটা নিজেই প্রকাশ করব। আমি কিছুটা পড়াশোনা করে এসেছি ওদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে। আপনার পরিচয়, আমার ভারতীয় বন্ধু। শুধু আমার আসল পরিচয় কারও কাছে ফাঁস না করলেই হল।"

সুদীপ্ত জানতে চাইল, "আপনি যখন রাইকে ওসব কথা জিজ্ঞেস করলেন, তখন তিনি কিছু সন্দেহ করেননি?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "সম্ভবত করেননি। ওঁর খবরটা কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। এ ধরনের খবর সব মানুষকেই আকৃষ্ট করে। আমি ওঁকে বলেছি, খবরটা অদ্ভুত বলেই আমি ওঁর কাছ থেকে নিছক কৌতূহলবশতই তার সত্যতা যাচাই করলাম। তা ছাড়া ক্রিপ্টোজুলজি বা ক্রিপ্টোজুলজিস্টদের কাজকর্ম সম্পর্কে সাধারণ মানুষ পরিচিত নয়, কাজেই সন্দেহ না হওয়ারই কথা।"

বিকেল হয়ে এসেছে। পাহাড়ের চুড়োগুলোতে ধীরে-ধীরে শুরু হয়েছে রঙের খেলা। লাল, গোলাপি, বেগুনি, নীল রঙে কোনও অদৃশ্য জাদুকর যেন রাঙিয়ে দিচ্ছে পাহাড়ের মাথাগুলোকে। এ এক অদ্ভুত দৃশ্য। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "আমরা যে অভিযানে যাচ্ছি, তা কতটা সফল হবে আমরা জানি না। কিন্তু প্রকৃতির এই অপরূপ সৌন্দর্য উপভোগ করার সৌভাগ্য খুব অল্প মানুষের জীবনেই ঘটে! এটাও কম প্রাপ্তি নয়।"

সেই ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকগুলো আধ মাইল দূরে একটা পাহাড়ি তাকের কাছে গিয়ে থেমে গিয়েছেন। হেরম্যান তা দেখে বললেন, "ওঁরা বোধ হয় আজকের মতো তাঁদের যাত্রার ইতি ঘটালেন। আমরাও ওখানে গিয়েই থামব।"

সে জায়গায় পৌঁছতে আরও প্রায় এক ঘণ্টা মতো সময় লাগল সুদীপ্তদের। ততক্ষণে আগের দলটা তাদের তাঁবু-টাবু খাটিয়ে ফেলেছে। তাদের পাশেই নিজেদের তাঁবু ফেলার পর হেরম্যান বললেন, "চলুন, একবার রাই আর ওই বীরবাহাদুর ছেত্রীর সঙ্গে কথা বলে আসি।"

প্যারাশুট কাপড়ের তাঁবুটার টানাগুলোয় ভারী পাথর চাপা দেওয়ার পর সুদীপ্তরা এগোল এই জনমানবহীন পার্বত্য অঞ্চলে তাদের প্রতিবেশীদের তাঁবুর দিকে।

চারটে তাঁবু। একটা কমলা রঙের তাঁবুর সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন বনবিভাগের লোগো আঁকা জ্যাকেট পরা দু'জন নেপালি ভদ্রলোক। সুদীপ্তরা সেই তাঁবুর সামনে গিয়ে দাঁড়াতেই সেই দু'জন লোক হাসিমুখে অভ্যর্থনা জানালেন হেরম্যানকে। তিনি সুদীপ্তর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় করিয়ে দিলেন। দু'জনের মধ্যে একজন দীর্ঘকায়, নেপালিদের মধ্যে সাধারণত ওরকম লম্বা চেহারা দেখা যায় না, তিনি রেঞ্জার বীরবাহাদুর। অন্যজন হলেন রাই। তাঁরা দু'জনেই প্রৌঢ় লোক। তবে চেহারার গড়ন বেশ শক্তপোক্ত।

সুদীপ্তর সঙ্গে তাঁদের পরিচয় পর্ব মেটার পর হেরম্যান বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কাল কতটা এগোবেন?"

বীরবাহাদুর বললেন, "দেখুন, এই মুহূর্তে আমরা প্রায় বারো হাজার ফিট উচ্চতায় অবস্থান করছি। স্নো লেপার্ড সাধারণত এই সময় বারো থেকে চোদ্দো হাজার ফিট উচ্চতায় থাকে। আমি ঠিক করেছি, আরও হাজার দুই ফিট উপরে উঠব আগামী কাল। তারপর অনুসন্ধান চালাব। আপনি কতটা এগোবেন?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "কাল আমিও ওরকমই উঠব। ওখানে একটা প্রাচীন বৌদ্ধমঠ আছে, সেটা দেখতে যাব।"

রাই শুনে জানতে চাইলেন, "আপনারা কি মিগু গুম্ফায় যাওয়ার কথা ভাবছেন? তা হলে আমার একটা কথা জানানোর আছে?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, ওখানেই। কী কথা জানানোর আছে?"

রাই বললেন, "ওই মঠের যিনি প্রধান লামা, যে লোকটা চিতা পোষে, লোকটা একদম মিথ্যেবাদী। আমার চাকরি যাওয়ার পিছনে ওর একটা ভূমিকা আছে।"

"কীরকম?"

হেরম্যানের প্রশ্নের জবাবে রাই বললেন, "আমি যখন আমার অফিসে গিয়ে সেই বিরাট বড় দোপেয়ে প্রাণীটা দেখার কথা রিপোর্ট করি। তখন আমার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষর তরফ থেকে, দু' জনকে পাঠানো হয়েছিল ব্যাপারটা সম্বন্ধে অনুসন্ধান করতে।

"কিন্তু ওই মঠের প্রধান লামা তাঁদের জানিয়ে দেন, সেরকম কোনও প্রাণী মঠে কেন, এই হিমালয়ের কোথাও নেই। তিনি বহু বছর এ তল্লাটে আছেন, ওরকম কোনও প্রাণী এ অঞ্চলে থেকে থাকলে তিনি নাকি অবশ্যই তাকে দেখতে পেতেন। আমি নাকি ব্যাপারটা ভুল দেখেছি, অথবা আমার চিকিৎসা করানো প্রয়োজন। সে কারণেই তো আমার চাকরিটা আরও গেল। ব্যাটা মিথ্যেবাদী! আমি স্পষ্ট দেখলাম কাটারের শব্দ শুনে তুষারপাতের মধ্যে প্রাণীটা তোরণ দিয়ে গুম্ফার ভিতর অদৃশ্য হয়ে গেল।"

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "প্রাণীটা কী রঙের?"

তিনি জবাব দিলেন, "আমার যত দূর মনে হয় ধূসর রঙের। যে কারণে সাদা বরফের মধ্যেও আমি প্রাণীটাকে আলাদা ভাবে চিহ্নিত করতে পেরেছিলাম।"

বীরবাহাদুর এবার হঠাৎ বললেন, "কিছু মনে কোরো না রাই, এমনও তো হতে পারে, ওই প্রাণীটা ফারের ওভারকোট পরা কোনও লম্বাচওড়া মানুষ? তুষার ঝড় থেকে বাঁচতে দৌড়ে মঠের ভিতর ঢুকছিল?"

তাঁর কথা শোনামাত্রই ক্যাপ্টেন রাই বেশ উত্তেজিত ভাবে বললেন, "হ্যাঁ, সেরকম কোনও ব্যাপার হতেই পারত, কিন্তু তুমি কি কোনও মানুষকে সাধারণ ভাবে কুড়ি ফুট লাফাতে দেখেছ? লং জাম্পারদের মতো ছুটে এসে লাফ নয়। না ছুটেই খুব যেন স্বাভাবিক ভাবে মাত্র কয়েকটা লাফে অন্তত একশো ফুট জায়গা পার হয়ে ভিতরে ঢুকল প্রাণীটা। তোমরা যা খুশি ভাবতে পার ঘটনাটা নিয়ে, কিন্তু ব্যাপারটা সত্যি।"

বীরবাহাদুর এর পর এ প্রসঙ্গে আর কথা না বাড়িয়ে সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, "চলুন, বাইরে না দাঁড়িয়ে তাঁবুর ভিতরে বসে কথা

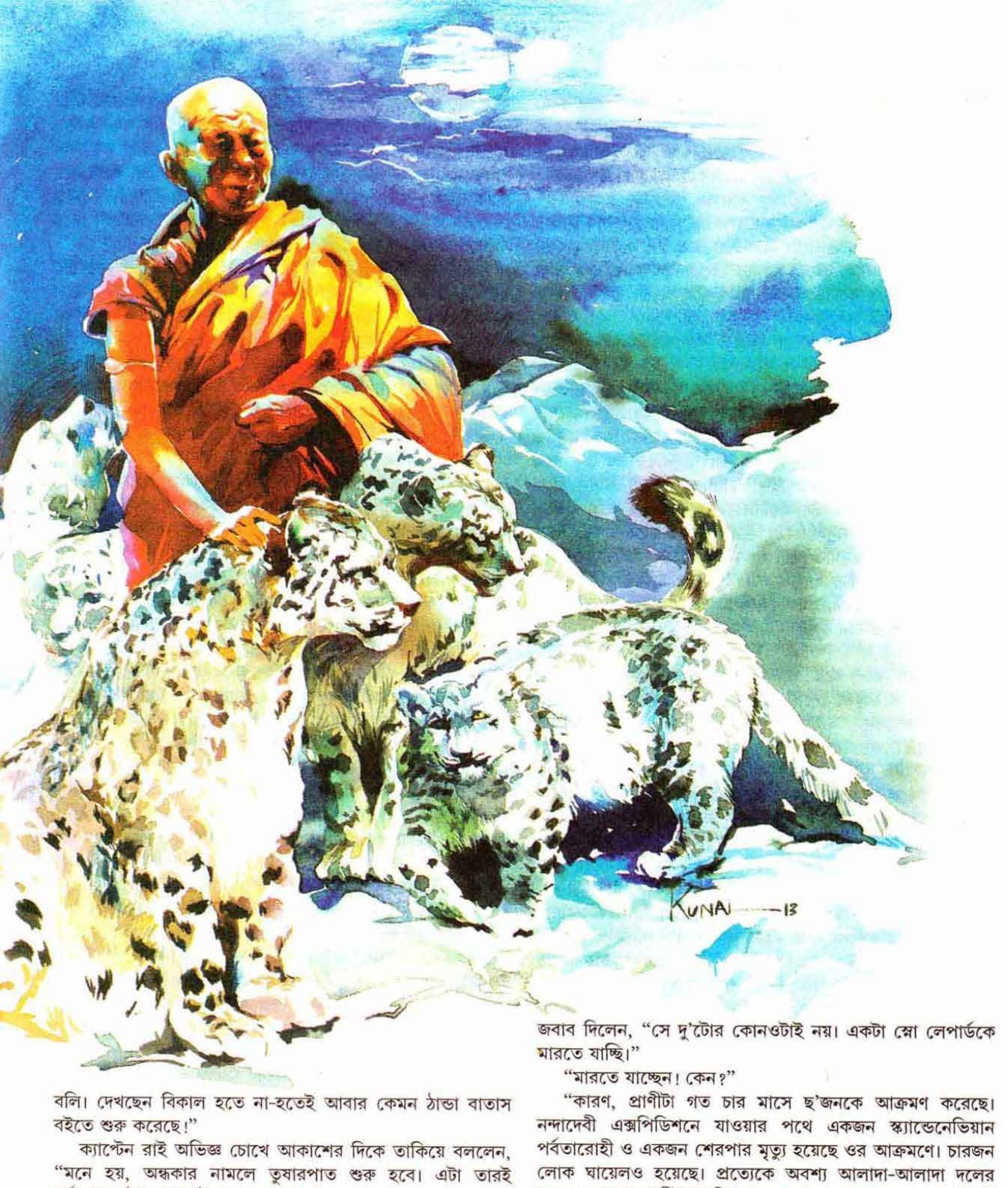

বলি। দেখছেন বিকাল হতে না-হতেই আবার কেমন ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে!"

ক্যাপ্টেন রাই অভিজ্ঞ চোখে আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "মনে হয়, অন্ধকার নামলে তুষারপাত শুরু হবে। এটা তারই পূর্বাভাস। হ্যাঁ, চলুন তাঁবুতে বসা যাক।"

তাঁবুর ভিতর ঢুকে সিন্থেটিক ম্যাটের উপর গুটিসুটি মেরে বসলেন সকলে। তাঁবুর একটা অংশ দখল করে রেখেছে ক্যামেরার ব্যাগ, স্লিপিং ব্যাগ, রুকস্যাক ইত্যাদি জিনিসপত্র। বীরবাহাদুর একটা ব্যাটারিচালিত আলো জ্বালালেন। সেই আলোতে তাঁবুর কোণে রাখা দু'টো রাইফেলও দেখতে পেল সুদীপ্ত। সে বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করল, "শুনলাম, আপনারা তুষারচিতার খোঁজে যাচ্ছেন? বাঘশুমারির মতো তুষারচিতা শুমারির কোনও ব্যাপার? নাকি তাদের সংরক্ষণের ব্যাপারে?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে সুদীপ্তদের অবাক করে বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "সে দু'টোর কোনওটাই নয়। একটা স্নো লেপার্ডকে মারতে যাচ্ছি।"

"মারতে যাচ্ছেন! কেন?"

"কারণ, প্রাণীটা গত চার মাসে ছ'জনকে আক্রমণ করেছে। নন্দাদেবী এক্সপিডিশনে যাওয়ার পথে একজন স্ক্যান্ডেনেভিয়ান পর্বতারোহী ও একজন শেরপার মৃত্যু হয়েছে ওর আক্রমণে। চারজন লোক ঘায়েলও হয়েছে। প্রত্যেকে অবশ্য আলাদা-আলাদা দলের সদস্য। সরকার প্রাণীটাকে বিপজ্জনক ঘোষণা করেছেন, আর তাই..."

তাঁর কথা শেষ করার আগেই হেরম্যান প্রশ্ন করলেন, "প্রাণীদের নিয়ে আমারও কিছু পড়াশোনা আছে। স্নো লেপার্ড মানুষখেকো হয় বলে শুনিনি তো?"

বীরবাহাদুর বললেন, "প্রাণীটা সে অর্থে মানুষখেকো কিনা জানি না, তবে মানুষকে আক্রমণ করছে এটা সত্যি। এক শেরপার কাঁধের কিছুটা মাংস সে খেয়েছিল, বাকিদের খায়নি বা খাওয়ার সুযোগ পায়নি। স্নো লেপার্ড আকারে বাঘের চেয়ে ছোট, ধূর্ততায় চিতার মতনও নয়। তাদের খাদ্যতালিকায় সাধারণত থাকে পাহাড়ি ভেড়া, কস্তুরী হরিণ, খরগোশ, ফেজেন্ট এসব। বরং তাদের বুদ্ধি কিছুটা কম

থাকায় শিকারিরা ভেড়ার টোপ ফেলে ওদের সহজেই শিকার করে। বাঘ, সিংহ, চিতার চামড়ার চেয়েও ওদের চামড়া অনেক বেশি মূল্যবান। সাধারণত মানুষকে এড়িয়ে চলে ওরা। তবে প্রাণীজগতে অনেক সময় ব্যতিক্রম ঘটে। ও প্রাণীটা হয়তো তারই একটা নমুনা।"

এর পর একটু থেমে বীরবাহাদুর বললেন, "জানেন, একসময় বহু বছর আগে পরিবারের লোকজনের সঙ্গে ছেলেবেলায় আমি শিকার খেলতে আসতাম এ তল্লাটে। এটা ছিল আমাদের হান্টিং গ্রাউন্ড। আমার এখনও মনে আছে, আমার ঠাকুরদা একবার একজোড়া তুষারচিতা শিকার করেছিলেন এখানে। পরে অবশ্য চাকরির সূত্রে অনেকবার এসেছি এ জায়গায়।"

সুদীপ্ত একটু বিস্মিত ভাবে বলল, "আপনারা এখানে শিকার করতেন?"

বীরবাহাদুর মৃদু হেসে বললেন, "হ্যাঁ, আমার পরিবারের লোকজন এখানে শিকার করতে আসতেন। আমার পূর্বপুরুষরা ছিলেন ছোট ভূস্বামী বা জমিদার। নেপালের রানা অর্থাৎ রাজার খুব অনুগত ছিলেন তাঁরা। আমার এক পূর্বপুরুষ দুর্গাবাহাদুর কোনও এক যুদ্ধে রানাকে খুব সাহায্য করেন। তার পুরস্কারস্বরূপ তিনটি জিনিস তাঁকে দান করেন। তার মধ্যে ছিল একটা হিরে, একটা পুঁথি ও এ অঞ্চলে শিকার করার একটা অনুমতিপত্র। হিরেটা পরবর্তীকালে অভাবে পড়ে বেচে দেওয়া হয়। অনুমতিপত্রটা এখনও আছে।"

"আর পুঁথিটা? কীসের পুঁথি ওটা?" জানতে চাইলেন হেরম্যান।

বীরবাহাদুর বললেন, "একটা তিব্বতি পুঁথি। আর ওটা পড়েই তো কেমন যেন হয়ে যান তিনি। বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে গৃহত্যাগ করেন তিনি।"

চারজনের মধ্যে এর পর আলোচনা শুরু হল সারাদিনের যাত্রাপথের অভিজ্ঞতা নিয়ে। কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর একসময় হেরম্যান বললেন, "বাইরে অন্ধকার নেমেছে। এবার আমাদের তাঁবুতে যাই। আপনাদের, আমাদের সকলেরই এবার বিশ্রামের প্রয়োজন।"

তাঁবু থেকে বেরতে যাচ্ছিল তারা। ঠিক সেই সময় হঠাৎ স্লিপিং ব্যাগের উপর রাখা চামড়ায় বাঁধানো দু'টো বই দেখে সে দু'টো বই হাতে তুলে নিল সুদীপ্ত। দু'টো বই-ই ইংরেজিতে লেখা। তার একটার নাম 'স্নো লেপার্ডস অফ হিমালয়াস' আর অন্যটার নাম 'ক্রায়োজেনিক্স'। জেমস ডেওয়ার-এর লেখা। দ্বিতীয় এই বইটা বেশ পুরনো। 'ক্রায়োজেনিক্স' অর্থাৎ 'অতি শৈত্যবিদ্যা' বা 'হিমবিজ্ঞান।'

বীরবাহাদুর বললেন, "এ বইটা আমার পারিবারিক লাইব্রেরির। অনেক পুরনো বই আছে আমাদের চিতওয়ানের হাভেলিতে। আমারও নানা বিষয়ে পড়াশোনার শখ আছে। তিব্বতি ভাষাটাও আমি পড়তে পারি। জানেন, আমাদের চিতওয়ানের বাড়িতে একটা ছোটখাটো ল্যাবরেটরিও আছে। দুর্গাবাহাদুর একসময় বানিয়েছিলেন সেটা। বিজ্ঞানের ব্যাপারেও আমার বেশ কিছুটা ঝোঁক আছে।"

বেশ কিছুক্ষণ গল্পগুজবের পর সুদীপ্তরা যখন বাইরে পা রাখল, তখন ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হয়েছে।

॥ ৪ ॥

ভোরবেলা সুদীপ্তরা যখন তাঁবু ছেড়ে বেরল, তখন আকাশ পরিষ্কার হয়ে গিয়েছে। কিন্তু মিহি তুষারের চাদরে মুড়ে আছে চারপাশ। বীরবাহাদুররা আগেই উঠে পড়ে তাঁর গোটানোর তোড়জোড়

করে নিচ্ছে। শেরপারা দেখে নিচ্ছে তাদের যাত্রাপথে বরফের নীচে কোথাও কোনও ফাটল আছে কিনা, কখনওবা প্রয়োজনে বরফ-পাথরের খাঁজে লোহার গজাল বা আইস-এক্স পুঁতে রোপ টাঙানোর ব্যবস্থা করছে। সুদীপ্তদের অগ্রবর্তী লোকগুলোর পদচিহ্ন আঁকা হয়ে যাচ্ছে নরম তুষারে। তার উপর পা ফেলে সুদীপ্তরা এগোচ্ছে। সুদীপ্ত হেরম্যানকে জিজ্ঞেস করল, "মিগু গুম্ফায় যাঁরা সেই মাথাটা নিয়ে যাচ্ছেন, তাঁদের পায়ের ছাপ আর চোখে পড়েছে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "না, পড়েনি। তাঁদের আমি শেষবার দেখেছিলাম আমাদের যাত্রাপথের পশ্চিমের একটা ঢালে। হয়তো অন্য কোনও পথে মিগু গুম্ফায় যাচ্ছেন তাঁরা। তাঁদের হয়তো কোনও সংক্ষিপ্ত পথ জানা আছে। তাই এ পথে তাঁদের পায়ের ছাপ নেই।"

এর পর হেরম্যান বললেন, "তুষারে এই আমাদের পায়ের ছাপ যেমন আঁকা হয়ে থাকছে, তেমনই আঁকা কিছু ছাপ কিন্তু এই তুষার রাজ্যে অন্য কোনও দোপেয়ে জীবের উপস্থিতি সম্পর্কে মানুষের মনে ধারণা জাগিয়েছে।"

"সেটা কীরকম?"

হেরম্যান চলতে-চলতে বললেন, "চার্লস হাওয়ার্ড বেরির লাকপা লা গিরিসংকটে সুবিশাল পায়ের ছাপ দেখার কথা তো আপনাকে বলেইছি। আরও কয়েকটা ছাপ দেখার ঘটনা বলি। রয়েল জিওগ্রাফিক্যাল সোসাইটির ফোটোগ্রাফার টোমবাজি ১৯২৫ সালে প্রথম তুষারমানব দেখেছেন বলে দাবি করেন। ১৫ হাজার ফিট উচ্চতায় জেমু হিমবাহের কাছে মাত্র তিনশো গজ উপর থেকে প্রাণীটাকে দ্যাখেন কয়েক মুহূর্তর জন্য। একটা রডোডেনড্রন গাছের মাথা ধরে দাঁড়িয়েছিল সেই দোপেয়ে জীবটা। হতে পারে, পুরো ব্যাপারটাই টোমবাজির দৃষ্টিবিভ্রম। কিন্তু ঘণ্টা দুই পর নীচে নেমে যখন তিনি সে জায়গায় পৌঁছোন, তখন সে জায়গায় তিনি মানুষের পায়ের মতো বেশ কিছু ছাপ দেখতে পান। তবে সেই ছাপগুলো ছিল প্রায় ১৫ ইঞ্চি লম্বা! এমনই ঘটনা আবার প্রত্যক্ষ করেন ১৯৫১ সালে এরিক শিপটন তাঁর এভারেস্ট অভিযানে। ছ' হাজার মিটার উচ্চতায় তিনি অগস্ট মাসের শেষ দিকে দেখতে পান ওরকম বিশাল পদচিহ্ন। তার পাশে একটা আইস-এক্স রেখে ফোটো তো তোলেন শিপটন। জানি না পৃথিবীবিখ্যাত ফোটোটা আপনি দেখেছেন কিনা? এর ঠিক দু' বছর পর ১৯৫৩ সালে ঐতিহাসিক এভারেস্ট অভিযানে তেনজিং নোরগেও ওই ছাপ দেখেছিলেন বলে দাবি করেন। আমি আপনাকে যেসব অভিযানের কথা বললাম তার একটাও কিন্তু গল্পের প্রয়োজনে তৈরি নয়। ছাপগুলো কীসের, তা নিয়ে বিতর্ক থাকলেও ঘটনা ও চরিত্ররা কিন্তু সত্যি।"

সুদীপ্ত বলল, "ওই ছাপগুলো সম্পর্কে অন্য মতামতগুলো কী?"

হেরম্যান জবাবে বললেন, "অনেকে বলেন, ওই ছাপগুলো তুষারনেকড়ে বা ওই ধরনের কোনও প্রাণীর ছাপ। তুষার গলে-টলে ওইরকম আকার ধারণ করেছে। কিন্তু এ তত্ত্বটা অনেক ক্ষেত্রে মেনে নেওয়া যায় না। কারণ, এমন অনেক জায়গায় পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে, যেখানে অত উঁচুতে তুষারনেকড়ে উঠতে পারে না। বেশ কিছু খাড়া দেওয়ালের গায়েও ওই ছাপ দেখা গিয়েছে। যেখানে মানুষ বা বানর জাতীয় প্রাণীরাই হাত ব্যবহার করে উপরে উঠতে পারে। তা ছাড়া শিপটনের ফোটোগুলো যদি আপনি দ্যাখেন, তা হলে বুঝতে পারবেন ছাপগুলো অবিকল মানুষের পায়ের ছাপের মতো দেখতে!"

সময়ের সঙ্গে-সঙ্গে এগিয়ে চলল তারা। চলার পথে কখনও তুষারমোড়া নিঃসঙ্গ প্রান্তর, কখনও বা পথ আটকে দাঁড়ানো দুর্লঙ্ঘ্য

উপরে উঠে এসেছি। ওই যে মাথার উপর দূরে ওই পাথরের তাক দেখছেন, ওটা আরও হাজার ফুট হবে। ঘণ্টাচারেক উঠতে হবে ওখানে পৌঁছতে। জায়গাটায় গিয়ে আমরা তাঁবু ফেলব। আর আপনারা যাবেন মঠের দিকে। ওখান থেকে একটা বরফসেতু পেরিয়ে উপরে উঠলেই দেখতে পাবেন গুম্ফাটা।"

হেরম্যান জানতে চাইলেন, "আপনি ওখানে গিয়েছেন কখনও?"

বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "না যাইনি কখনও, তবে অনেকবার দূর থেকে দেখেছি। আমার ঠাকুরদা যখন এখানে শিকার করতে আসতেন, তখন একবার করে ওই গুম্ফায় গিয়ে মঠাধ্যক্ষের আশীর্বাদ নিতেন। তবে তিনি একলাই যেতেন ওখানে।"

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আপনারা যে চিতাটাকে খুঁজছেন, তাকে পাবেন কীভাবে?"

বীরবাহাদুর বললেন, "এ ব্যাপারে আমি এই রাইয়ের উপরই ভরসা রাখছি। ওর কিন্তু অনেক গুণ। একাধারে বৈমানিক, মাউন্টেনিয়ার, আবার দক্ষ শিকারিও। বাঘটা তার পিছনের ডান পায়ের পাতা ঠিক মতো ফেলতে পারে না। ছাপ দেখেই ওকে শনাক্ত করতে হবে। তারপর রাইয়ের কাজ।"

হেরম্যান বললেন, "শুনেছি মিগু গুম্ফায় নাকি বেশ কিছু পোষা তুষারচিতা আছে। ব্যাপারটা কি সত্যি?"

বীরবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ, আমিও তেমনই শুনেছি। তবে তুষারচিতা কিন্তু সাধারণ ভাবে পোষ মানে না। ব্যাপারটা গল্পও হতে পারে।"

রাই এবার বললেন, "না, ব্যাপারটা সত্যি। এমনও হতে পারে যে, গুম্ফার চিতাগুলোর কোনও একটাই এ কাণ্ড ঘটাচ্ছে। প্রয়োজন বুঝলে মঠে ঢুকে ওটাকে সাবাড় করব। দেখি ওঁরা কীভাবে আটকান আমাকে।"

তাঁর কথা শুনে সুদীপ্ত বুঝতেই পারল, ওই মিগু গুম্ফার লোকেদের উপর সত্যিই বেশ চটে আছেন ক্যাপ্টেন রাই।

ধূমায়িত পাত্রে সেদ্ধ নুড্‌লস দিয়ে গেল। রাই দূরের সেই পাহাড়ের তাকটার দিকে সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বললেন, "তাকটার মাথার উপরটা বেশ অস্পষ্ট লাগছে। অর্থাৎ ওখানে তুষারপাত হচ্ছে। তাড়াতাড়ি রওনা হতে হবে।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই খাওয়া সেরে আবার যাত্রা শুরু করল সকলে। যত উপরে উঠছে সুদীপ্তরা, বাতাস তত হালকা হচ্ছে। এক-এক সময় বেশ কষ্ট হচ্ছে শ্বাস নিতে। তার মধ্যেই ক্রমশ উপরে উঠছেন সকলে। মাঝে-মাঝে দু'টো গিরিখাতের মাঝখান থেকে শিসের মতো তীব্র শব্দে ধেয়ে আসছে হিমেল বাতাস। হাড় পর্যন্ত কাঁপন ধরছে সে বাতাসে। কখনও বা মেঘের দল এসে ভিজিয়ে দিচ্ছে তাদের। তবুও চলার বিরাম নেই তাদের। তুষারধবল পর্বতশৃঙ্গগুলোর আড়ালে লুকোচুরি খেলতে-খেলতে সূর্যও এগিয়ে চলল তাদের সঙ্গে। সুদীপ্তরা যখন সেই তাকের কাছে পৌঁছল, তখন বিকেল হয়ে গিয়েছে।

ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হচ্ছে। ক্যাপ্টেন রাই ঠিকই বলেছিলেন, তুষারপাতের জন্যই নিচ থেকে এ জায়গাটাকে ধোঁয়া-ধোঁয়া মনে হচ্ছিল।

তাকে দাঁড়িয়ে বীরবাহাদুর বললেন, "আমরা এ জায়গাতেই তাঁবু ফেলে অনুসন্ধান চালাব। একই জায়গায় আছি যখন, তখন নিশ্চয়ই আমাদের দেখা হবে। আর প্রয়োজনে পরস্পর পরস্পরের সাহায্যও আমরা নিশ্চয়ই আশা করতে পারি?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, হ্যাঁ, নিশ্চয়ই। আমিও ঠিক এই কথা আপনাদের বলতে যাচ্ছিলাম।"

রাই আবার সুদীপ্তদের সতর্ক করে দিয়ে বললেন, "যেখানে যাচ্ছেন সে জায়গা কিন্তু ভাল না। ওই মঠাধ্যক্ষ লোকটা সুবিধের নয়। চোখ-কান খোলা রাখবেন, আর প্রয়োজনে আমাদের সঙ্গে যোগাযোগ করবেন।"

সুদীপ্তরা এর পর দেখতে পেলেন, বরফ ঢাকা সেই প্রাকৃতিক সেতুটা। দু'টো পাহাড়ের ঢালের মধ্যে সংযোগ রক্ষা করছে সেটা। রাই বললেন, "সেতু পেরিয়ে ওপাশের পাহাড়ের ঢালের পিছনের তাকেই মিগু গুম্ফা।"

তাদের থেকে বিদায় নিয়ে সুদীপ্তরা এগোল সেতুর দিকে। বরফপিচ্ছিল সর্পিল সেতু। তার উপর আবার তুষারপাত ক্রমশ বাড়ছে। তিনশো ফুট লম্বা হবে সেতুটা, চওড়া মাত্র হাতচারেক। দু' পাশে অতলান্ত খাদ, দৈবাৎ কেউ পা ফসকালে জীবিত-মৃত কোনও অবস্থাতেই আর খুঁজে পাওয়া যাবে না কাউকে। লম্বা একটা নাইলনের দড়ির দু'টো প্রান্ত ভাল করে নিজেদের কোমরে বাঁধার পর সেতুতে উঠল তারা। তুষারপাত ক্রমশ বাড়ছে, তার উপর বাতাসের প্রবল ঝাপট। প্রথমে হেরম্যান। তার হাতদশেক তফাতে সুদীপ্ত। তুষারপাতের দাপটে সামনেটা প্রায় ঝাপসা। ইঞ্চি-ইঞ্চি করে এগোতে লাগল তাঁরা। সুদীপ্তর এক-এক সময় মনে হতে লাগল, যেন অনন্তকাল ধরে এই সেতু পার হচ্ছে তারা। তবে শেষ পর্যন্ত সেতু পার হয়ে ওপাশে তারা পৌঁছে গেল। কিন্তু তুষারপাত আরও এমন বেড়ে গেল যে, বেশ কিছুক্ষণ তাদের একটা পাথরের ফাটলে ঢুকে অপেক্ষা করতে হল।

তারপর তুষারস্নাত পাহাড়ের ঢাল বেয়ে উপরে উঠতে-উঠতে উলটো পিঠে যাওয়ার পথ ধরলেন। একসময় গন্তব্যে পৌঁছে গেল তারা। সুদীপ্ত দেখতে পেল, তাদের সামনে দাঁড়িয়ে আছে বেশ বড় একটা প্রাচীন গুম্ফা। তুষারপাত হঠাৎই যেন কোন অলৌকিক কারণে থেমে গিয়েছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে শেষ বিকেলের আলো এসে পড়েছে তুষারচাদর বিছানো মঠের ঢালু ছাদে, সামনের ছোট্ট প্রাঙ্গণে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে নিঃসঙ্গ এক ধর্মস্তম্ভ বা চোর্তেন। বরফস্নাত প্রাঙ্গণে কোনও লোকজন নেই। সুদীপ্তরা যে পথে উঠে এসেছে, সে পথ ছাড়া মঠে যাওয়ার অন্য কোনও রাস্তা নেই। দু'দিকে গভীর খাদ আর অন্য একটা দিকে পাথরের একটা দেওয়াল যেন পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন করে রেখেছে মিগু গুম্ফাকে। সেই দেওয়ালের গায়ে দূর থেকে একটা গুহামুখও নজরে পড়ল সুদীপ্তদের। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "চোখ-কান একটু খোলা রাখবেন।"

তারপর তিনি সুদীপ্তকে নিয়ে বরফস্নাত প্রাঙ্গণ পেরিয়ে এগোলেন মঠের প্রবেশ-তোরণের দিকে।

তারা দু'জন মঠের প্রধান তোরণের সামনে এসে দাঁড়াল। তোরণের মাথায় খোদিত আছে ভীষণদর্শন তিব্বতি অপদেবতাদের কয়েকটা মুখ। তবে বয়সের ভারে জীর্ণ তারা। মুখগুলোর কিছু অংশ খসে পড়েছে। কাঠ আর পাথরের তৈরি দেওয়ালের গা একসময় মনে হয় চিত্রশোভিত ছিল। সেসব ছবি এখন অস্পষ্ট। হেরম্যান চাপা স্বরে একবার বললেন, "এ মঠ মনে হয় তিন-চারশো বছর পুরনো হবে।"

তারপর তিনি ঘা দিলেন দরজায়।

বেশ কয়েকবার দরজায় ঘা দেওয়ার পর ভিতর থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল। কয়েক মুহূর্তের নিস্তব্ধতা, তারপর ক্যাঁচ ক্যাঁচ শব্দ করে ভারী দরজাটা খুলে গেল। দরজা খুলে দাঁড়ালেন মুণ্ডিতমস্তক দীর্ঘকায় অতিবৃদ্ধ এক লামা। কিছুটা ন্যুব্জ হলেও তাঁর উচ্চতা সাড়ে ছ' ফুটের বেশি হবে। এত লম্বা মানুষ সচরাচর দেখা যায় না। তাঁর কত বয়স তা অনুমান করা মুশকিল। অসংখ্য বলিরেখাময় মুখ, ভ্রুহীন, রোমহীন অক্ষিপল্লব। লাল রঙের পরিধেয় তিব্বতি বস্ত্রের বাইরে বেরিয়ে থাকা হাতগুলোয় যেন হাড়ের উপর শুধু চামড়া কাগজের মতো লেগে আছে। তিনি বেশ শান্ত স্বরে ইংরেজিতে বললেন, "আপনারা কারা?"

হেরম্যান পরিকল্পনামাফিক নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, "আপনি কি এ মঠের প্রধান লামা?"

তিনি আবারও বেশ মৃদুস্বরে জবাব দিলেন, "হ্যাঁ, আমিই মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি।"

হেরম্যান বললেন, "আমাদের পরিচয় তো আপনাকে দিলাম। আমার সঙ্গে পরিচয়পত্র, পাসপোর্ট এসব আছে। চাইলে আপনি সেসব দেখতে পারেন। আমি বহু দূর থেকে এই দুর্গম জায়গায় এসেছি আপনার মঠের সাহচর্যে ক'দিন থেকে আপনাদের জীবনযাত্রা-ধর্ম-দর্শনকে জানব বলে। যদি আপনি এই মঠে আমাদের দু'জনকে থাকার

জন্য অনুমতি দেন, তবে আপনার কাছে আমরা কৃতজ্ঞ থাকব। আমি জানতে চাই এই দুর্গম জায়গায় কীভাবে ভগবান বুদ্ধর উপাসনা করেন আপনারা?"

হেরম্যান লামা ডং রিম্পুচিকে কাগজপত্র দেখার কথা বললেও সুদীপ্ত খেয়াল করল, তাঁর কোটরগত মণি দু'টো কেমন যেন স্থির নিষ্প্রভ, দৃষ্টিহীন। হেরম্যান অবশ্য সুদীপ্তকে আগেই বলেছিলেন এ ব্যাপারটা। লামা ডং রিম্পুচি দৃষ্টিহীন মানুষ।

হেরম্যানের কথা শুনে ডং রিম্পুচির ঠোঁটের কোণে যেন অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। লামা বললেন, "কাগজের লেখা দেখে মানুষের পরিচয় জানা গেলেও তার মনের কথা কি জানা যায়? কী হবে পরিচয়পত্র দেখে? কিন্তু যে কারণেই আপনারা আসুন না কেন, আসতে বড় দেরি করে ফেলেছেন। আর ক'টা দিন মাত্র, তারপরই এই মঠ ত্যাগ করে আমরা চলে যাচ্ছি।"

হেরম্যান বললেন, "তা হলে? আমরা কি এ মঠে থাকার অনুমতি পাব না?"

হেরম্যানের কথা শুনে লামা রিম্পুচি কয়েক মুহূর্ত নিশ্চুপ হয়ে কী যেন ভাবলেন, তারপর সুদীপ্তদের সেখানেই দাঁড়াতে বলে মঠের ভিতর অন্ধকারে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পাহাড় থেকে ঠান্ডা বাতাস বইতে শুরু করেছে। সেই বাতাসে উড়ছে মঠের একধারে কয়েকটা খুঁটির গায়ে লাগানো বিবর্ণ হয়ে যাওয়া ছিন্ন পতাকাগুলো। ওদের বলে লুংদার। তিব্বতি ভাষায় মন্ত্র লেখা ধর্মীয় পতাকা। এ পতাকা সব বৌদ্ধমঠেই দেখা যায়। এই ঠান্ডা বাতাস অন্ধকার নামার পূর্বাভাস। হেরম্যান চত্বরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "ভিতরে আশ্রয় না পেলে আজ রাতটা আমাদের বাইরে এই ঠান্ডার মধ্যেই কাটাতে হবে। এখন আর ফেরা যাবে না। উনি কি ভিতরে কাউকে ডাকতে গেলেন?"

বাইরে দাঁড়িয়ে রইল সুদীপ্তরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই আবার অবশ্য তাঁর পায়ের শব্দ শোনা গেল। মঠের অন্ধকারের ভিতর থেকে একটা আলো এগিয়ে আসছে। একটা প্রদীপ নিয়ে আবার ফিরে এলেন লামা ডং রিম্পুচি। তারপর সুদীপ্তদের উদ্দেশে বললেন, "মিগু গুম্ফায় মঠাধ্যক্ষ আপনাদের স্বাগত জানাচ্ছে। আপনারা ভিতরে আসুন।"

হেরম্যান সুদীপ্তর সঙ্গে মৃদু দৃষ্টি বিনিময় করার পর লামাকে ধন্যবাদ জানিয়ে সুদীপ্তকে নিয়ে পা রাখলেন মঠের ভিতর। ভিতরে প্রবেশ করতেই সুদীপ্তর নাকে এসে লাগল একটা অদ্ভুত গন্ধ। অনেক পুরনো বাড়িতে যেরকম গন্ধ থাকে, ঠিক সেরকম গন্ধ। দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধ করে দিয়ে সুদীপ্তদের নিয়ে একটা বারান্দা ধরে এগোলেন মঠের ভিতর দিকে। আলো-আঁধারি খেলা করছে মঠের ভিতর। তারই মধ্যে কোথাও দেওয়ালের গা থেকে উঁকি দিচ্ছে অদ্ভুতদর্শন ভয়াল ধর্মীয় মূর্তি, কোথাও বা চিকচিক করে উঠছে মাথার উপর থেকে ঝুলন্ত সোনালি সুতোয় বোনা ধর্মীয় চাদর থাংকা। বারান্দার দু' পাশে সারিবদ্ধ অন্ধকার সব ঘর। এক অদ্ভুত নৈঃশব্দ্য বিরাজ করছে সারা মঠ জুড়ে। তাঁদের তিনজনের পায়ের শব্দ ছাড়া আর কোনও শব্দ নেই।

এগিয়ে চলেছেন লামা। কোনও লোকজন না দেখতে পেয়ে সুদীপ্ত কৌতূহলবশত লামা রিম্পুচিকে জিজ্ঞেস করল, "এত বড় মঠে অন্য কোনও লোকজন নেই? আপনি একাই থাকেন?"

তিনি অদ্ভুত একটা জবাব দিলেন, "একাও বলতে পারেন, আবার তা না-ও বলতে পারেন।"

বারান্দার শেষ মাথায় একটা কাঠের সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠে লামা তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন দোতলার একটা ঘরে। ঘরটা পরিচ্ছন্ন। কাঠের দেওয়াল, কাঠের মেঝে। ঘরের এক কোণে শোয়ার জায়গাও আছে। কুলুঙ্গিতে রাখা আছে একটা বুদ্ধমূর্তি। খোলা জানলা দিয়ে দেখা যাচ্ছে সামনের চত্বর আর পাহাড়শ্রেণি। তার আড়ালে সূর্য তখন মুখ লুকিয়েছে। অন্ধকার নামছে পাহাড়ের বুকে।

ঘরে ঢুকে লামা সুদীপ্তদের বললেন, "এই আপনাদের থাকার জায়গা। জানি, এখানে থাকতে আপনাদের কষ্ট হবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধর অতিথিদের জন্য এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা করার সুযোগ আমার নেই। আমাকে ক্ষমা করবেন!" বেশ নম্র ভাবে কথাগুলো বললেন তিনি।

হেরম্যান সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "না-না, এখানে থাকতে আমাদের কোনও অসুবিধে হবে না। আপনি যে আমাদের এখানে থাকার ব্যবস্থা করলেন তার জন্যই আমরা কৃতজ্ঞ।"

প্রদীপের আলোয় হাসির আভাস দেখা দিল বৃদ্ধের বলিরেখাময় মুখে। তিনি বললেন, "ভগবান বুদ্ধ আপনাদের আশীর্বাদ করুন। অনেকটা পথ আপনারা এসেছেন, আজকের মতো বিশ্রাম নিন। কাল মঠটা ঘুরে দেখবেন। আজ আর আপনাদের সঙ্গে দেখা হবে না এর পর। আমি এখন নীচে প্রার্থনাকক্ষে বসব। কাল সব কথা হবে।"

এই বলে তিনি তাঁর হাতের বড় প্রদীপটা বুদ্ধমূর্তিতে নামিয়ে রেখে ঘর ছেড়ে ধীর পায়ে বাইরে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর পায়ের শব্দ মিলিয়ে গেল সিঁড়ির দিকে।

তিনি চলে যাওয়ার পর জানলা-দরজা বন্ধ করে দিলেন হেরম্যান। সুদীপ্তর পাশে বসে তিনি বললেন, "এমনিতে লোকটাকে খারাপ বলে মনে হল না। তবে তিনি এ মঠে একা থাকেন কিনা, সে ব্যাপারটা কিন্তু স্পষ্ট করলেন না।"

সুদীপ্ত বলল, "লোকটা দৃষ্টিহীন, কিন্তু কী অবলীলায় তিনি হেঁটেচলে বেড়াচ্ছেন মঠের ভিতর। ওঁর চোখের দিকে না তাকালে বোঝাই যাবে না উনি দৃষ্টিহীন।"

হেরম্যান বললেন, "উনি দীর্ঘদিন এ মঠে আছেন। মঠের সব কিছু ওঁর নখদর্পণে। তা ছাড়া দৃষ্টিহীন মানুষদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো প্রখর হয়, তাই উনি এমন সাবলীল ভাবে চলাফেরা করতে পারেন।"

একথা বলার পর হেরম্যান বললেন, "থাক, এসব ব্যাপারে এখন আর কোনও আলোচনা নয়। আজ সারাদিন অনেক ধকল গিয়েছে। এখন আমরা শুয়ে পড়ব। কাল ভোরে উঠে যা পরিকল্পনা করার, তা করব। তবে একটা ব্যাপার, চোখ-কান কিন্তু সবসময় খোলা রাখবেন।"

ঘরের এক কোণে কাঠের তৈরি খাটের মতো একটা জায়গা আছে। সত্যিই বড্ড ধকল গিয়েছে আজ। সামান্য কিছু খাবার খেয়ে রিম্পুচির রেখে যাওয়া চর্বির প্রদীপটা নিভিয়ে ঘরের কোণে সে জায়গায় নিজেদের জিনিসপত্র বিছিয়ে শুয়ে পড়ল দু'জন। সারাদিনের পরিশ্রমের ক্লান্তিতে কিছুক্ষণের মধ্যেই ঘুম নেমে এল সুদীপ্তর চোখে।

মাঝরাতে আবার হেরম্যানের ডাকে ঘুম ভেঙে গেল সুদীপ্তর। উঠে বসতেই হেরম্যান চাপাস্বরে বললেন, "জানলা দিয়ে একটা অদ্ভুত দৃশ্য দেখা যাচ্ছে! ব্যাপারটা আপনাকে দেখানোর জন্য ঘুম ভাঙালাম।"

হেরম্যানের কথা শুনে তাঁর পিছন-পিছন সুদীপ্ত গিয়ে দাঁড়াল জানলায়। চাঁদের আলোয় উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। বরফের উপর চাঁদের আলো পড়ে মনে হচ্ছে, ঠিক যেন কেউ গলিত রুপো ছড়িয়ে দিয়েছে মঠের সামনের চত্বরে, আর ওই পাহাড়গুলোর গায়ে। ঝিরিঝিরি তুষারপাতও হচ্ছে। আর তার মধ্যেই মন্দির চত্বরে চোর্তেন স্তম্ভের ঠিক নীচে দাঁড়িয়ে আছেন মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি। তাঁকে ঘিরে রয়েছে বেশ কয়েকটা বড় প্রাণী। কেউ বসে আছে তাঁর পায়ের কাছে, কেউ তাঁর গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে, কেউ বা তাঁর গায়ে ওঠার চেষ্টা করছে বা তাঁকে ঘিরে পাক খাচ্ছে। ডং রিম্পুচি মাঝে-মাঝে গায়ে হাত দিয়ে আদর করছেন প্রাণীগুলোকে। প্রাণীগুলো সাদা রঙের, গায়ে বেশ বড়-বড় কালো ছোপ, মাঝে-মাঝে তারা লেজ ঝাপটাচ্ছে বরফের উপর। তাদের সবুজ চোখগুলো জ্বলছে!

"ওগুলো কী প্রাণী?"

"তুষারচিতা! এ ব্যাপারটা তা হলে সত্যি!" জবাব দিলেন হেরম্যান।

সুদীপ্ত বলল, "প্রাণীগুলো তো যে-কোনও মুহূর্তে আক্রমণ করতে পারে ওঁকে! এই হিংস্র প্রাণীগুলোকে উনি বশ মানালেন কীভাবে?"

হেরম্যান বললেন, "অনেকে বলেন, এই লামাদের অনেক রকম অলৌকিক বা অতিপ্রাকৃতিক ক্ষমতা থাকে। উনি হয়তো সেই

ক্ষমতাবলেই বশ মানিয়েছেন ওদের। তবে একটা ব্যাপার নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে, এ পৃথিবীতে এমন অনেক ব্যাপার থাকে যা সাধারণ মানুষের কাছে অবিশ্বাস্য মনে হলেও আসলে তা সত্যি। হয়তো আমরা যাকে খুঁজতে এসেছি, সেও আসলে লুকিয়ে আছে এই বরফ প্রান্তরের কোথাও। তুষারমানব সত্যিই আছে।"

সুদীপ্তরা দেখতে লাগল লামা আর প্রাণীগুলোকে। বেশ কিছুক্ষণ পর লামা যেন প্রাণীগুলোকে কী বললেন। তা শুনে প্রাণীগুলো দল বেঁধে ধীরে-ধীরে চত্বর ছেড়ে খাদের দিকে অদৃশ্য হয়ে গেল। লামা রিম্পুচি হাঁটতে শুরু করলেন চত্বরের ডান দিকের সেই দেওয়ালটার দিকে। তারপর যেন তিনি কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

॥ ৫ ॥

ভোরবেলা জানলা খুলতেই একরাশ উজ্জ্বল আলো ছড়িয়ে পড়ল সুদীপ্তদের ঘরে। তুষার-ছাওয়া চত্বরের মাঝে চোর্তেনটা দাঁড়িয়ে আছে। ওরই নীচে চাঁদের আলোয় তুষারচিতাদের সঙ্গে গতকাল রাতে খেলছিলেন লামা ডং রিম্পুচি। দিনের আলোয় সে দৃশ্যটা এখন নিছকই কল্পনা বলে মনে হচ্ছে। বাইরে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, "বাঃ, বেশ সুন্দর পরিবেশ! মঠের ভিতরটা দেখার পর একবার বাইরেও যাব। চারপাশটাও একবার দেখতে হবে। বীরবাহাদুররাও তো বরফসেতুর ওপাশেই আছেন। তাঁদের সঙ্গেও একবার দেখা করা যেতে পারে।"

হেরম্যানের কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সিঁড়িতে অস্পষ্ট পায়ের শব্দ শোনা গেল। তারপর ঘরের দরজায় এসে দাঁড়ালেন রিম্পুচি। দিনের আলোয় সুদীপ্তরা প্রথম দেখতে পেলেন তাঁকে। রাতে তাঁরা হয়তো সেভাবে খেয়াল করেননি। কিন্তু দিনের আলোয় লামার মুখটা কেমন যেন ফোলাফোলা মনে হল তাঁদের। যেন তাঁর শীর্ণ দেহের সব রক্ত এসে জমা হয়েছে মুখে। তবে তাঁর চোখের মণি দু'টো একদম স্থির। কোনও জ্যোতি নেই তাঁর সে দু'টো চোখে। কিন্তু এই অতিবৃদ্ধ লামার বয়স কত হবে, তা ঠিক অনুমান করতে পারলেন না সুদীপ্তরা। তাঁর ভ্রূর কোনও অস্তিত্বই নেই। কোনও-কোনও লামা নাকি দু'-তিনশো বছরও বাঁচেন বলে শোনা যায়। লামা স্মিত হেসে সুপ্রভাত জানিয়ে সুদীপ্তদের বললেন, "আশা করি আপনাদের ঘুম ভাল হয়েছে? আপনারা তৈরি থাকলে আমি আপনাদের মঠটা ঘুরিয়ে দেখাতে পারি।"

হেরম্যানও প্রতি-সম্ভাষণ জানিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, আমরা তৈরি।"

মঠাধ্যক্ষ তাঁদের ইশারায় অনুসরণ করতে বললেন। সুদীপ্তরা বেরিয়ে এল ঘর থেকে। সিঁড়ি দিয়ে নামার পর লামা রিম্পুচি তাদের প্রথম যে ঘরে নিয়ে এলেন, সেটা একটা লাইব্রেরি। বিরাট বড় ঘরটায় কাঠের র‍্যাকে থরে-থরে কাপড়ে মোড়া প্রাচীন পুঁথি সাজানো আছে। বেশ কিছু বইও সেখানে আছে। দেখেই বোঝা যাচ্ছে সেগুলো বেশ পুরনো। প্রাচীন একটা গন্ধ ভেসে বেড়াচ্ছে আলো-আঁধারি মাখা ঘরের ভিতর।

লামা রিম্পুচি বললেন, "আপনারা যে বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে জানতে এসেছেন, তার সবই লেখা আছে এই সব পুঁথির মধ্যে। তাই প্রার্থনা কক্ষে যাওয়ার আগে আপনাদের এ ঘরে নিয়ে এলাম। তবে এত পুঁথি আপনারা এখানে বসে নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন না। কারণ, এ মঠ ছেড়ে ক'দিনের মধ্যে চলে যেতে হবে। আমরা মঠ ছেড়ে যাওয়ার পর এই সব পুঁথি নীচের গুম্ফায় নামিয়ে নিয়ে যাওয়ার কথা। সেখানে অবশ্য সময় নিয়ে পুঁথিগুলো আপনারা দেখতে পারেন।"

হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন, "কোথায় চলে যাচ্ছেন আপনারা?"

"আরও উপরে। হিমালয়ের আরও গভীরে, আরও দুর্গম কোনও স্থানে," জবাব দিলেন ডং রিম্পুচি।

"সেখানে যাচ্ছেন কেন? সেখানেও কি কোনও মঠ আছে?" জানতে চাইল সুদীপ্ত।

লামা বললেন, "না, সেখানে কোনও মঠ নেই। থাকার জায়গা বলতে সেখানে পাহাড়ের কোনও গুহা বা উন্মুক্ত বরফাচ্ছাদিত কোনও প্রাঙ্গণ। সেখানে গিয়ে আরও কৃচ্ছ্রসাধন করে ভগবান বুদ্ধের আরও কাছে পৌঁছতে পারব। সাধনার বিভিন্ন স্তর আছে। একসময় আমি নীচের মঠে ছিলাম, তারপর এখানে উঠে এলাম আরও কৃচ্ছ্রসাধনের জন্য। এখানের কাজ শেষ হয়ে গিয়েছে। এবার চলে যাব আরও উপরে। সাধনার আরও উচ্চমার্গে, বলা যেতে পারে অন্তিম মার্গে পৌঁছনোর জন্য।"

"ঠিক কবে এ মঠ ত্যাগ করছেন?" জানতে চাইলেন হেরম্যান।

ডং রিম্পুচি বললেন, "খুব বেশি হলে তিন-চার দিন, তেমন হলে কালও চলে যেতে পারি। পুরো ব্যাপারটা নির্ভর করছে কয়েকটা ব্যাপারের উপর।"

কী ব্যাপার সেটা ভদ্রতার খাতিরে জিজ্ঞেস করতে পারল না সুদীপ্ত বা হেরম্যান। প্রশ্ন একান্তই ব্যক্তিগত হয়ে যেত।

লামা নিজের জায়গায় দাঁড়িয়ে রইলেন। লাইব্রেরি ঘরটা একটু ভাল করে দেখার জন্য কাঠের র‍্যাকগুলোর আশপাশে ঘুরতে শুরু করলেন সুদীপ্তরা। একটা র‍্যাকে কিছু ইংরেজি বইও রাখা আছে। পুরু ধুলোর স্তর জমেছে বইগুলোর উপর। পুঁথিগুলো সব তিব্বতি ভাষায় লেখা, সুদীপ্ত তা পড়তে পারবে না, কিন্তু ইংরেজি বইগুলো পড়া যেতে পারে। তাই সে ধুলো ঝেড়ে বইগুলো দেখতে লাগল। 'লাইফ অব মিলারাপা', 'ওয়ার্কস অফ পদ্মসম্ভব' বৌদ্ধতান্ত্রিক যোগীপুরুষদের জীবন-কাজ এসবের উপর লেখা বইগুলো। তারই মধ্যে থেকে হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের বই হাতে পেয়ে বেশ অবাক হয়ে গেল সুদীপ্ত। বইটার নাম 'ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স।' এখানে এ বিষয় সংক্রান্ত বই! বীরবাহাদুরের কাছেও এ বিষয়ে একটা বই দেখেছেন তাঁরা। সুদীপ্তর ক্রায়োজেনিক্স শব্দটা জানা থাকলেও ক্রায়োনিক্স শব্দের অর্থ জানা নেই। যে বইটা হেরম্যানকে দেখিয়ে বলল, "ক্রায়োনিক্স শব্দের মানে জানেন?"

হেরম্যান বললেন, "শব্দটা আগে শোনা, তবে মানেটা এই মুহূর্তে ঠিক মনে আসছে না।" এই বলে তিনি বইটা হাতে নিয়ে দেখতে যাচ্ছিলেন, ঠিক সেই সময় লামা রিম্পুচি বললেন, "চলুন, এবার আপনাদের প্রেয়ার হলটা দেখাই। এ ঘর তো খোলাই রইল, পরে নয় আবার এ ঘরে আসবেন। আমাকে আবার উপাসনায় বসতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে বইটা তাকে রেখে দিয়ে সুদীপ্তরা তাঁকে অনুসরণ করল। কয়েকটা ঘর পেরিয়ে সুদীপ্তরা এসে ঢুকল প্রেয়ার হলে। ঘরটা অন্ধকার। একটা জানলা খুলে দিতেই আলোকিত হয়ে উঠল ঘর। ঘরটা বিশাল। মাথার উপর হাতে-টানা পাখার মতো ঝুলছে কারুকাজ করা বিরাট থাংকা। সারা দেওয়াল জুড়ে নানা অলংকরণ, ছবি। সেখানে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে ভগবান বুদ্ধের জীবনকথা, জাতক কাহিনি। সুদীপ্তদের সামনেই দেওয়ালের গা ঘেঁষে কাঠের স্ট্যান্ডের উপর রাখা আছে নানা বাদ্যযন্ত্র। বিরাট বড় শিঙা, ডুগডুগি, আর একটা জয়ঢাক। ঢাক বাজানোর জন্য যে জিনিসটা তার উপর রাখা আছে, সেটা যে মানুষের উরুর হাড়, তা দেখেই বুঝতে পারল সুদীপ্তরা। আর ঘরের দেওয়ালে ঝুলছে কাঠের তৈরি অপদেবতাদের নানা মুখ। তাদের কেউ ভয়ংকর দাঁত বের করে আছে, কারও বা লকলকে জিভ, ভাঁটার মতো চোখ, কেউ বা নরমুণ্ড-শোভিত। দেওয়ালের গা থেকে তারা যেন সব তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের। কেমন যেন একটা অদ্ভুত রহস্যময় পরিবেশ বিরাজ করছে সারা ঘর জুড়ে। বাইরের আলোও সেই রহস্যময়তা কাটাতে পারছে না।

ঘরের শেষ প্রান্তে একটা বেদিতে অধিষ্ঠান করছেন ভগবান গৌতম। আর বেদির ঠিক নীচেই রাখা কাঠের তৈরি বিরাট কফিনের মতো একটা লম্বা বাক্স। ঘিয়ের প্রদীপ জ্বলছে তাঁর সামনে। বুদ্ধমূর্তিটা অন্য ধরনের, কঙ্কালসার ধ্যানী বুদ্ধমূর্তি। তাঁর করোটি, পঞ্জরাস্থি, হাত-পায়ের হাড় সবই প্রকট ভাবে দৃশ্যমান। আর পাথরের তৈরি অস্থিচর্মসার কোলে রাখা আছে নীচের গুম্ফায় দেখা সেই বিরাট খুলিটা, আর লাল শালুতে মোড়া একটা প্রাচীন পুঁথি। আগেরবার

দেখার সময় তত আলো ছিল না, কিন্তু এবার বেশি আলোয় দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল, খুলি দু'টো যে প্রাণীরই হোক না কেন, এখনও সে প্রাণীর চামড়ার কিছু অংশ খুলির মাথায় লেগে আছে। কালচে রোমশ চামড়া।

খুলি দু'টোকে আলোয় ভাল করে দেখার পর সুযোগ বুঝে হেরম্যান লামা ডং রিম্পুচিকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, ওই বিরাট বড় খুলিটা কোন প্রাণীর?"

রহস্যময় হাসির রেখা ফুটে উঠল লামা রিম্পুচির ঠোঁটের কোণে। সুদীপ্তদের চমকে দিয়ে তিনি বললেন, "ওই খুলিগুলোর আকর্ষণেই তো আপনারা পাহাড়-পর্বত-বরফপ্রান্ত পেরিয়ে এ মঠে এসেছেন, তাই না? ওটা বরফদেশের রাজার মাথা।" লামা কি থট রিডিং জানেন? নাকি মনের ভাব পড়তে পারেন? হেরম্যান ব্যাপারটা ততটা গুরুত্বপূর্ণ নয়, এই ভাব দেখাবার চেষ্টা করে বললেন, "নীচের মঠে খুলিটা দেখে এ সম্বন্ধে আমার জানার ইচ্ছে হয়েছে ঠিকই। কারণ, আপনাদের প্রত্যেকটা ব্যাপারেই আমার জানার আগ্রহ আছে। আলাদা ভাবে তেমন কিছু নয়।"

হেরম্যানের কথা শুনে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর ডং রিম্পুচি গম্ভীর ভাবে বললেন, "আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ভগবান বুদ্ধ সহস্রবার সহস্র রূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে হাতির মতো বিরাট প্রাণী রূপেও তিনি পৃথিবীতে ফিরে আসেন। ওগুলো যার খুলি সে রূপেও তিনি এসেছিলেন পৃথিবীতে। আমরা তন্ত্রসাধনায় তাঁর সে রূপেরই উপাসনা করি। তাঁর সহস্র রূপের মধ্যে ক'টা রূপই আর সাধারণ মানুষ জানে! এসব তন্ত্রসাধনার গূঢ় বিষয়।"

সুদীপ্ত এবার জিজ্ঞেস করল, "সেটা কোন প্রাণীর রূপ?"

লামা শান্ত স্বরে বললেন, "এসব গোপন তত্ত্ব আমার পক্ষে আপনাদের বলা সম্ভব নয়। আমাকে মাপ করবেন।"

সুদীপ্তকে বেশ আকৃষ্ট করেছে বেদির সামনে রাখা বিরাট সিন্দুকটা। কী আছে ওর মধ্যে? ঘরের চারপাশে ঘুরতে-ঘুরতে বারবার আড়চোখে সে তাকাতে লাগল সিন্দুকটার দিকে। কিছু সময় পর ডং রিম্পুচি বললেন, "এবার সময় হয়ে গিয়েছে। আমি এখন প্রার্থনায় বসব। ইচ্ছে করলে আপনারা নিজেরাই মঠের অন্য জায়গাগুলো ঘুরে দেখতে পারেন।"

হেরম্যান একটু ভেবে নিয়ে বললেন, "বাইরে আবহাওয়াটা আজ বেশ চমৎকার। আমরা বরং এখন বাইরে থেকে ঘুরে আসি।"

লামা বললেন, "হ্যাঁ, ঘুরে আসতে পারেন। তবে যেখানেই যান, অন্ধকার নামার আগে মঠে ফিরবেন। আর একটা ব্যাপারে আপনাদের সতর্ক করে দিই। ইদানীং এখানে একটা তুষারচিতা মানুষকে আক্রমণ করছে। পাহাড়ের গায়ে কোনও গুহা দেখলে সেখানে ঢুকতে যাবেন না, বিশেষত মঠের কাছে দেওয়ালের গায়ে যে গুহাটা আছে। প্রাণীটা ওখানে আত্মগোপন করে থাকতে পারে।"

লামা ডং রিম্পুচি আর কোনও কথা বললেন না। মূর্তিবেদির নীচে পাতা আসনে বসে, তার পাশে রাখা একটা জপযন্ত্র তুলে নিয়ে ঘরঘর শব্দে সেটা ঘোরাতে-ঘোরাতে দুর্বোধ্য ভাষায় মন্ত্রোচ্চারণ শুরু করলেন।

সুদীপ্তরা মঠের বাইরে বেরিয়ে এল। সত্যি, বাইরের পৃথিবীটা আজ বড় চমৎকার। নির্মেঘ আকাশ। ধোঁয়াশা বা কুয়াশার চিহ্ন নেই কোথাও। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে পর্বতশৃঙ্গগুলো। ওই তো নন্দাদেবী, ওই তো ত্রিশূলের তিনটে শৃঙ্গ! ওই তো ভৃগুপন্থ, বান্দরপুচ্ছ! আর সকলের উপর ওই যে দূরে স্বদর্পে মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মাউন্ট এভারেস্ট। যেদিকেই তাকানো যায়, সেদিকেই দাঁড়িয়ে আছে পাহাড় আর পাহাড়!

সুদীপ্ত জিজ্ঞেস করল, "আপনি বাইরে এলেন কেন? শুধু প্রকৃতির শোভা দেখতে, নাকি অন্য কোনও কারণে?"

হেরম্যান বললেন, "মঠের ভিতরটা আমরা কিছুটা দেখলাম, এবার দিনের আলোয় বাইরে চারপাশটা একবার ভাল করে দেখে নিই। যদি কোথাও কোনও পায়ের ছাপ-টাপ বা ওই ধরনের কোনও সূত্র মেলে? তা ছাড়া যদি বীরবাহাদুরের দলটার সঙ্গে দেখা হয়ে যায়। ওরা তো রাতটা বাইরেই কাটাল। যদি কোনও খবর পাওয়া যায়!"

মঠের চারপাশে বেশ কিছুক্ষণ ঘুরল তারা। তিন দিকে অবশ্য গভীর খাদ। মঠের তাকের মতো চত্বরটা হঠাৎই যেন তিন দিকে গিয়ে শেষ হয়ে গিয়েছে। খাদের দেওয়ালগুলো ঢালু নয়, একদম খাড়া নীচের দিকে নেমে গিয়েছে। সেসব দিক দিয়ে নিচ থেকে উপরে ওঠার সুযোগ নেই। চোর্তেনটার সামনে বেশ কিছুক্ষণ দাঁড়ালেন তাঁরা, যেখানে গত রাতে লামা তুষারচিতাগুলোকে আদর করছিলেন। তাদের পায়ের ছাপ এখন আর অবশ্য সে জায়গায় নেই। গত রাতের তুষারপাত ঢেকে দিয়েছে সব। চত্বরের গা ঘেঁষে দাঁড়িয়ে থাকা গুহামুখের দিকে সুদীপ্ত তাকাল। তার ভিতর জমাটবাঁধা অন্ধকার।

মঠচত্বর ছেড়ে সুদীপ্তরা এর পর এগোল যে পথে তারা এসেছিল, সে পথে। যেতে-যেতে সুদীপ্ত বলল, "আপনার কী মনে হয়, লামা রিম্পুচি এত বড় গুম্ফায় একাই থাকেন? আর কাউকে তো দেখলাম না!"

হেরম্যান বললেন, "কথা বলার সময় লামা কিন্তু 'আমি' না বলে বেশ কয়েকবার 'আমরা' শব্দ ব্যবহার করলেন। এর অর্থ তিনি একলা মঠে থাকেন না। হয় মঠের অন্য কেউ বা অন্যরা সাময়িক ভাবে বাইরে আছেন, অথবা মঠেই কোথাও...।"

তিনি কথা শেষ করার আগেই সুদীপ্ত বলল, "প্রার্থনাকক্ষের ভিতর অদ্ভুত সিন্দুকটা খেয়াল করেছেন? ওর মধ্যে লামার মতো লম্বা লোকও অনায়াসে ঢুকে যেতে পারে। এমনকী, তার চেয়ে বড় কোনও প্রাণীও। আচ্ছা লামা 'আমরা' বলতে সেই প্রাণীকেও বোঝাননি তো?"

হেরম্যান সুদীপ্তর কথার জবাবে বললেন, "এ ব্যাপারটা অসম্ভব না-ও হতে পারে। দেখলেন তো ওই খুলিটার ব্যাপারে লামা বললেন যে, তাঁদের বিশ্বাস ভগবান বুদ্ধ তাঁর সহস্র জীবরূপে জন্মের মধ্যে ওই বিশেষ প্রাণীরূপেও জন্মেছিলেন। অর্থাৎ খুলিটা যে প্রাণীর, তার অস্তিত্ব এক সময় পৃথিবীতে ছিল বা আছে। প্রাণীটা অলীক নয়। আর প্রাণীটার নামও বললেন না তিনি। প্রাণীটা যদি পরিচিত কোনও প্রাণী হয়, তবে তার ব্যাপারে এত গোপনীয়তা কেন?"

পরিষ্কার আকাশ, তুষারপাত বা বাতাসও বেশি নেই। বরফে উতরাই বেয়ে নামার সময় সতর্ক থাকতে হচ্ছে ঠিকই, কিন্তু পরিশ্রম বেশি হচ্ছে না। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, "ইয়েতি বা এধরনের প্রাণীর কথা কিন্তু নানা ভাবে নানা দেশে শোনা যায়। যেমন, আমেরিকার ইয়েতি বা 'বিগ ফুট'। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়ার পর্বতসঙ্কুল অরণ্যে রাস্তা তৈরির সময় বহু মানুষ সেই দানবাকৃতি রোমশ মানুষকে দেখেছেন বলে দাবি করেন। একজন বুলডোজার চালক 'জেরাল্ড ক্রু' প্লাস্টার সব প্যারিসে প্রাণীটার পায়ের ছাপও তোলেন। ছাপটা ছিল ১৮ ইঞ্চি লম্বা। কাগজে তার ফোটো ছাপা হলে আমেরিকা জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল ১৯৫৮ সালে। একই রকম মানুষের মতো রোমশ প্রাণী চিনের আর মালয়ের রবার বনে দেখা গিয়েছে বলে শোনা যায়। মায়ানমারের জঙ্গলেও এ ধরনের প্রাণীর গল্প অনেক শোনা যায়।"

কথা বলতে-বলতে নীচে নামার পর হঠাৎ সুদীপ্তরা দেখতে পেল বীরবাহাদুর, রাই আর জনাকয়েক লোককে। সেই তুষারসেতুটা পেরিয়ে তাঁরা এপারে চলে এসেছেন। রাই আর বীরবাহাদুর, দু'জনের কাঁধেই রাইফেল। সম্ভবত সেই চিতার খোঁজেই বেরিয়েছেন তাঁরা। কিছুক্ষণের মধ্যেই ঢালের নীচে দেখা হয়ে গেল দুই দলের। কুশল বিনিময়ের পর হেরম্যান বললেন, "আপনারা এপারে চলে এলেন?"

বীরবাহাদুর বললেন, "কাল রাতে সেতু পেরিয়ে আমাদের তাঁবুর কাছে চলে গিয়েছিল প্রাণীটা। ওদিকে বরফসেতুতে ওঠার সময় একজন পোর্টার তাকে দেখেছে। প্রাণীটা নাকি খুঁড়িয়ে হাঁটছিল। সেতুর উপরে কয়েক জায়গায় তার পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে। তিন ঠ্যাঙের ছাপ। সেতু পেরিয়ে এদিকে এসেছে প্রাণীটা। কিন্তু গত রাতে তারপর এপারে এত তুষারপাত হয়েছে যে, পায়ের ছাপ হারিয়ে

গিয়েছে।"

মিস্টার রাই সুদীপ্তদের জিজ্ঞেস করলেন, "একটা রাত তো কাটালেন ওই মঠে। কোনও অদ্ভুত ব্যাপার চোখে পড়ল কি? কোনও প্রাণীর দেখা পেলেন?"

হেরম্যান একটু ইতস্তত করে জবাব দিলেন, "না তেমন কিছু নয়, তবে..."

"তবে কী?" তীক্ষ্ণ স্বরে প্রশ্ন করলেন ক্যাপ্টেন রাই।

হেরম্যান বললেন, "কাল রাতে মঠচত্বরে একপাল তুষারচিতা নিয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন লামা।"

বীরবাহাদুর বিস্মিত ভাবে বললেন, "ব্যাপারটা তা হলে সত্যি!"

রাই বললেন, "আর সেই বিরাট রোমশ প্রাণীটার ব্যাপারও সত্যি। আমি তাকে স্পষ্ট দেখেছিলাম। আসলে ওই শয়তান লামাটা সব জানে। আমার অনুমান ওই চিতাটাও মঠেই আছে। ওই খোঁড়া চিতাটার খোঁজ না পেলে মঠের সব ক'টা চিতাকেই সাবাড় করব।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে মৃদু ধমকে তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "তুমি ভুলে যাচ্ছ, আমরা এখন সরকারি কাজে এখানে এসেছি। ছেলেবেলার মতো এটা আর এখন হান্টিং গ্রাউন্ড নয়। ওই বিশেষ প্রাণী ছাড়া অন্য কোনও প্রাণীকে মারার অনুমতি আমাদের নেই। তোমার দেখা ব্যাপারটা সত্যি ধরে নিয়েই বলি, হয়তো মঠাধ্যক্ষের কথায় তোমার ক্ষতি হয়েছে। কিন্তু মাথা ঠান্ডা রাখো। চলো, এবার প্রাণীটার খোঁজ করা যাক।"

চিতাটার পায়ের ছাপ খুঁজতে শুরু করলেন রাই-বীরবাহাদুররা। সুদীপ্তরাও যোগ দিল তাঁদের সঙ্গে। বেশ কিছুক্ষণ খোঁজাখুঁজির পর কয়েকটা পায়ের ছাপের সন্ধান পাওয়া গেল বটে, কিন্তু সে ছাপ সেই বিশেষ প্রাণীটার নয়। প্রায় দুপুর হয়ে গেল। বীরবাহাদুর একসময় বললেন, "এবার থামা যাক। ভাল করে পরিকল্পনা করে খোঁজা শুরু করতে হবে। আশপাশের পাহাড়ের খাঁজগুলোও দেখতে হবে।"

তাঁর কথা শুনে রাই বীরবাহাদুরকে বললেন, "তুমি বরং অন্যদের নিয়ে তাঁবুতে ফিরে যাও, আমি ওই যে ওই পাহাড়ের ঢালটা একবার দেখে আসি। এখন আমার ফেরার ইচ্ছে নেই।"

সুদীপ্তদেরও ফিরতে হবে। বীরবাহাদুর-রাইদের সঙ্গে মঠের উলটো দিকে চলে এসেছেন তারা। কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবাহাদুর তাঁর লোকজন নিয়ে তাঁবুর দিকে রওনা দিলেন।

"পরদিন আবার দেখা হবে," বলে সুদীপ্তরাও মিশু গুম্ফায় ফেরার পথ ধরলেন।

ফেরার পথে মঠের রাস্তায় একটু সংক্ষেপে পৌঁছনোর জন্য অন্য একটা পথ ধরলেন সুদীপ্তরা। রাস্তাটা চলার পক্ষে একটু সুবিধেজনকও বটে। তুষারের ফাঁক দিয়ে মাঝে-মাঝে উঁকি দিচ্ছে পাথর। পা হড়কে যাওয়ার ভয় নেই। সে পথে চলতে শুরু করে সুদীপ্ত কথা প্রসঙ্গে বলল, "রাই বলে লোকটা কিন্তু লামা রিম্পুচির উপর সত্যি খুব খাপ্পা। সুযোগ পেলেই তাঁকে গালাগালি করছেন।"

হেরম্যান বললেন, "তবে মিস্টার রাই কিন্তু সবসময় বেশ দৃঢ়তার সঙ্গেই বলছেন যে, ওই অদ্ভুত প্রাণীটাকে তিনি দেখেছিলেন। ফিরে গিয়ে যথাসম্ভব ভাল ভাবে মঠটা আমাদের দেখতে হবে। আর একটা কথা, বাইরের দিকেও নজর রাখা দরকার। পালা করে রাত জেগে জানলা দিয়ে বাইরেটা খেয়াল করব দু'জন। চত্বরে বা মঠে ওঠার পথ তো একটাই। কেউ মঠের বাইরে গেলে সেটা আমাদের নজর এড়াবে না।"

কথা বলতে-বলতে চলতে-চলতে হঠাৎ একটা জায়গায় থমকে দাঁড়িয়ে পড়লেন হেরম্যান। মাটির দিকে তাকিয়ে তাঁর ভ্রূ কুঁচকে গেল। এক জায়গায় নরম তুষারের উপর জেগে আছে স্পষ্ট কয়েকটা পায়ের ছাপ। কোনও অতিমানবের পায়ের ছাপ নয়। বরফে হাঁটার জন্য স্পাইকওলা যে ধরনের জুতো পরা হয়, সে ধরনের ছাপ। আশপাশে আরও বেশ কিছু ওই ধরনের ছাপও চোখে পড়ল। হেরম্যান মাটিতে ঝুঁকে পড়ে ছাপগুলো পরীক্ষা করে বললেন, "একজন নয়, দু'-তিনজন লোকের পায়ের ছাপ। পাথরে পা ফেলতে গিয়ে মাঝে-মাঝে তুষারে পা পড়ে ছাপগুলো তৈরি হয়েছে। উপর থেকে নীচে নেমেছে ছাপগুলো। সম্ভবত আমরা যেদিক থেকে এখন এলাম, সেদিকেই কোথাও গিয়েছে লোকগুলো।"

সুদীপ্ত বলল, "কিন্তু ছাপগুলো কাদের? আমরা দু'দল ছাড়া তৃতীয় কোনও দল কি আছে এখানে? হয়তো অন্য কোনও অভিযাত্রী দলের সদস্য? নাকি আমাদের সঙ্গে দেখা হওয়ার আগে মিস্টার রাইরা এদিকেও এসেছিলেন?"

হেরম্যান বললেন, "সেটা কাল জিজ্ঞেস করব ওঁদের। কিন্তু এটা তাদের পায়ের ছাপ নয়তো, লামা 'আমরা' বলতে যাদের বোঝাচ্ছেন?"

সুদীপ্তরা এর পর আবার চলতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা পৌঁছে গেল মঠে।

॥ ৬ ॥

দরজা ঠেলে মঠের ভিতর পা রাখল সুদীপ্তরা। বাইরের আলো ঝলমল, মুক্ত বাতাসের পৃথিবীর বদলে আবার মঠের ভিতরের সেই আধো-অন্ধকার রহস্যময়তা। ভারী বাতাসে প্রাচীন জিনিসপত্রের গন্ধ, ঘরের আনাচ-কানাচ থেকে অদৃশ্য কারা যেন তাকিয়ে দেখছে সুদীপ্তদের।

প্রেয়াররুমের ভিতর থেকে জপযন্ত্রের ঘরঘর শব্দ আর অস্পষ্ট মন্ত্রোচ্চারণ কানে আসছে। সুদীপ্ত উঁকি দিয়ে দেখল, মঠাধ্যক্ষ একই জায়গায় বসে আছেন। মঠের না দেখা ঘরগুলো দেখতে শুরু করল তারা। অধিকাংশ ঘরই ফাঁকা। ধুলো জমতে-জমতে দেওয়ালচিত্রগুলো সব ঝাপসা হয়ে গিয়েছে, মাথার উপর ঝুলন্ত থাংকাগুলো পোকায় কেটে খসে পড়ছে। মঠটা এত উঁচুতে অবস্থিত না হলে নির্ঘাত বাদুড়ের আড্ডা হত এ ঘরগুলো। কয়েকটা ঘরে অবশ্য কিছু পাথরের তৈরি দুর্লভ মূর্তি আছে। বুদ্ধমূর্তি, তান্ত্রিক বৌদ্ধদের নানা অপদেবতার মূর্তি। শেষ একটা ঘর অন্যরকমের। স্টাফ করা বেশ কিছু প্রাণীর দেহ রাখা আছে। পাহাড়ি ভল্লুক, তুষারচিতা, ভেড়া, হরিণ থেকে শুরু করে বেশ কয়েক ধরনের পাখিও আছে সেখানে। তবে অবহেলায় জিনিসগুলো নষ্ট হতে বসেছে। ধুলো আর পোকা চামড়াগুলোকে নষ্ট করছে। সুদীপ্ত বলল, "প্রাণীগুলোকে মঠে স্টাফ করা হয়েছিল কেন? এ জায়গা তো মিউজিয়াম নয়?"

হেরম্যান বললেন, "এগুলো হয়তো একসময় স্টাফ করা হয়েছিল মঠে আগত মানুষদের সঙ্গে এই তুষাররাজ্যের প্রাণীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়ার জন্য। আবার এমনও হতে পারে যে, তান্ত্রিক বৌদ্ধদের তন্ত্রসাধনার উপকরণ এই দেহগুলো। ঠিক যেমন ওই খুলিটা ব্যবহার করা হচ্ছে।"

সুদীপ্তদের একসময় উপর-নীচের ঘরগুলো দেখা হয়ে গেল। সুদীপ্তর হঠাৎ মনে হল, লাইব্রেরি থেকে কয়েকটা বই নিজেদের ঘরে নিয়ে গেলে সময় কাটানো যাবে। বিশেষত তার মনে পড়ে গেল ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স বইটার কথা। ক্রায়োনিক্স শব্দের অর্থ জানে না সুদীপ্ত। বইটা নেওয়ার জন্য লাইব্রেরিতে ঢুকল দু'জনে। কিন্তু বইটা যেখানে নামিয়ে রেখে গিয়েছিল, সেখানে অন্য বইগুলো আছে, কিন্তু সে জায়গা বা আশপাশে কোথাও নেই সেই বইটা। বেশ একটু অবাকই হল সুদীপ্ত। বইটা গেল কোথায়? অগত্যা পদ্মসম্ভবের বইটা নিয়ে উপরে উঠে এল তারা।

হেরম্যান বললেন, "এখন খেয়ে ঘুমিয়ে নিতে হবে নইলে রাত জাগা যাবে না।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই বইটা নিয়ে হেরম্যানের পাশে শুয়ে পড়ল সে। বইটা পড়তে-পড়তে ঘুমিয়ে পড়েছিল সুদীপ্ত। হেরম্যানের ডাকে ঘুম ভেঙে যখন সে উঠে বসল, তখন বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শোনা গেল, আর তারপরই ঘরে প্রবেশ করলেন লামা রিম্পুচি। তাঁর মুখের সেই অস্বাভাবিক রক্তজমাট ভাবটা এখন আর নেই। লোলচর্মের মুখমণ্ডল এখন ফ্যাকাসে। তাঁর হাতে ঘিয়ের প্রদীপ। সারাদিন উপাসনার কাজে ব্যস্ত ছিলেন বলে সুদীপ্তদের সঙ্গে কথা বলার সময় দিতে না পারায় প্রথমে ক্ষমা চেয়ে নিলেন তিনি। তারপর বললেন, "বাইরে কেমন ঘুরলেন?"

হেরম্যান বললেন, "সেই তুষারচিতাটাকে মারার জন্য শিকারিদের একটা দল এসেছেন। তাঁদের সঙ্গে কিছুটা পরিচয় হয়েছে এ পথে আসার সময়। ওঁদের সঙ্গেই কিছুটা সময় কাটালাম। চিতার পায়ের ছাপ খুঁজছিলেন ওঁরা।"

লামা বললেন, "ওঁরা যে এসেছেন, আমি জানি। তা রাই আমার সম্পর্কে কী বলল?"

সুদীপ্তরা একটু চমকে উঠে পরস্পরের মুখের দিকে তাকিয়ে চুপ করে গেল।

মঠাধ্যক্ষর ঠোঁটের কোণে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "থাক, আর বলতে হবে না, ও আপনাদের কী বলেছে আমি জানি। আমার সম্পর্কে সে ভাল কিছু বলেনি।"

অস্বস্তিকর প্রসঙ্গটা পালটানোর জন্য সুদীপ্ত বলল, "আচ্ছা, ওই তুষারচিতাটা মানুষকে আক্রমণ করছে কেন, বলুন তো?"

লামার উত্তরে এবার বেশ অবাক হয়ে গেলেন সুদীপ্তরা। তিনি বললেন, "তার কারণটা রাই-ই ভাল জানে।"

এর পর একটু থেমে লামা বললেন, "আপনাদের কাছে আমার একটা অনুরোধ আছে। যদি এ মঠের কোনও ব্যাপার আপনাদের কাছে অদ্ভুত বলে মনে হয়, তবে ব্যাপারটা নিজেদের মনের মধ্যেই রাখবেন। বাইরে কোথাও, ওই যারা এখানে এসেছে, তাদের সঙ্গে আলোচনা করবেন না। এ মঠে আপনাদের আশ্রয়দানের বিনিময়ে মঠের গোপনীয়তা রক্ষার ব্যাপারটা নিশ্চয়ই আপনাদের কাছ থেকে আশা করতে পারি?"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই পারেন। আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। কিন্তু অদ্ভুত ব্যাপার বলতে আপনি কী বোঝাচ্ছেন?"

লামা রিম্পুচি বললেন, "ওই যেমন গতকাল রাতে এ ঘরের জানলা দিয়ে দেখলেন যে, আমি তুষারচিতাগুলোর মাঝে দাঁড়িয়ে আছি, সেরকম কোনও ব্যাপার।"

কথাটা শুনেই চমকে উঠে সুদীপ্ত আর হেরম্যান লামার চোখের দিকে তাকাল। তাঁর চোখের মণি দু'টো স্থির, নিষ্প্রাণ। লামা তো দৃষ্টিহীন, তা হলে তিনি সুদীপ্তদের জানলা দিয়ে দেখার ব্যাপারটা বুঝলেন কীভাবে? সুদীপ্ত পদ্মসম্ভবের বইটায় পড়ছিল যে, তান্ত্রিক-বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের মধ্যে অনেকে নাকি অতিপ্রাকৃত ক্ষমতাসম্পন্ন হন। তাঁদের মধ্যে কেউ-কেউ নাকি আকাশে উড়ে বেড়াতে পারেন, কেউ ধ্যানস্থ অবস্থায় শূন্যে বিচরণ করতে পারেন, কেউ আবার নাকি বহু বছর ধরে মঠের নির্জন অন্ধকার উপাসনাকক্ষ থেকে বাইরে বেরোননি। কিন্তু সেই কক্ষে বসেই তিনি বলে দিতে পারেন, পাহাড়ে কোথায় কী ঘটে চলেছে। মঠাধ্যক্ষ লামা ডং রিম্পুচি কি তেমনই অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ?

লামা এর পর শুধু বললেন, "বাইরে অন্ধকার নেমে গিয়েছে। এ জায়গা আপনাদের অপরিচিত। বাইরে বেরলে কিন্তু বিপদ হতে পারে।" কথাগুলো বলে তিনি ধীর পায়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন। তাঁর ছায়াটা সিঁড়ির আড়ালে মিলিয়ে যাওয়ার পর হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "অবিশ্বাস্য!"

সুদীপ্ত বলল, "আমরা যে এ মঠে আরও কোনও অদ্ভুত ঘটনার সম্মুখীন হতে পারি, লামার কথায় তার ইঙ্গিত আছে।"

হেরম্যান বললেন, "আমারও তাই মনে হয়। আর একটা ব্যাপার হল, উনি বললেন, চিতাটা কেন মানুষকে আক্রমণ করছে তা মিস্টার রাই ভাল জানেন! এ কথার অর্থ কী?"

সময় এগোতে লাগল, রাত গভীর হল এক সময়। হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "আপনি এখন শুয়ে পড়ুন। অর্ধেক রাত আমি জাগি, শেষ রাতটা আপনি জাগবেন।"

এ কথা বলে হেরম্যান জানলার কাছে গিয়ে পাল্লাটা একটু ফাঁক করে সেখানে দাঁড়ালেন। সুদীপ্ত বেশ কিছুক্ষণ শুয়ে রইল, কিন্তু তারও ঘুম আসছে না। এক সময় সেও উঠে গিয়ে হেরম্যানের পাশে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরে আকাশে বেশ বড় চাঁদ উঠেছে। তবে মেঘের আনাগোনাও আছে। মাঝে-মাঝে খণ্ড-খণ্ড মেঘ এসে ঢেকে দিচ্ছে চাঁদটাকে। কিছুক্ষণের জন্য বরফাচ্ছাদিত চত্বরটা ঢেকে যাচ্ছে নিকষ কালো অন্ধকারে।

তখন মাঝরাত। সুদীপ্তরা প্রথম দেখতে পেল লামা ডংকে। তিনি ধীর পায়ে মঠ থেকে বেরিয়ে চত্বরের মাঝখানে চোর্তেনের সামনে গিয়ে দাঁড়ালেন। কিছু সময় কেটে গেল। সুদীপ্তর মনে হল, লামা যেন কোনও কিছুর প্রতীক্ষা করছেন। হঠাৎ একখণ্ড মেঘ এসে চাঁদটাকে ঢেকে দিল কয়েক মুহূর্তের জন্য। কিন্তু মেঘ সরে যেতেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল সেই অদ্ভুত পরিচিত দৃশ্য। একপাল তুষারচিতার

মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছেন লামা রিম্পুচি! প্রাণীগুলো এতক্ষণ ছিল কোথায়? চোর্তেন স্তম্ভের আড়ালে?

প্রাণীগুলো খেলতে শুরু করল লামার সঙ্গে। সুদীপ্তরা দেখতে লাগলেন সেই দৃশ্য। একসময় হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "ওই যে ওই দিকে দেখুন!"

তাঁর দৃষ্টি অনুসরণ করে সুদীপ্ত দেখল উপরে ওঠার রাস্তা বেয়ে কখন যেন চত্বরে উঠে এসেছে একজন লোক। তার কাঁধে রাইফেল। যদিও এত দূর থেকে তার মুখ বোঝা যাচ্ছে না। সেই ভৌতিক অবয়বটা যেন থমকে দাঁড়িয়ে মঠের দিকে তাকিয়ে আছে। কিছুক্ষণ পর সে সম্ভবত খেয়াল করল চোর্তেনের সামনে লামা আর তুষারচিতাগুলোর উপস্থিতি। কাঁধের রাইফেল খুলে নিয়ে লোকটা এগোল চোর্তেনের দিকে। বাতাস মনে হয় তার উপস্থিতি জানিয়ে দিল প্রাণীগুলোকে। সঙ্গে-সঙ্গে আগন্তুকের দিকে মুখ ফিরিয়ে ঘুরে দাঁড়াল তারা। লামার হাবভাবে মনে হল, তিনিও যেন লোকটার উপস্থিতি টের পেলেন। লোকটা এবার থমকে দাঁড়িয়ে লামার উদ্দেশে কী যেন বলল। লামা সঙ্গে-সঙ্গে প্রাণীগুলোকে সম্ভবত অন্যত্র চলে যাওয়ার নির্দেশ দিলেন। চিতাগুলো দল বেঁধে অদৃশ্য হয়ে গেল চত্বরের অন্য প্রান্তে। লোকটা এবার লামার কাছে এসে একটু ঝুঁকে সম্ভবত তাঁর পা ছুঁয়ে প্রণাম করল। কয়েকটা কথা হল তাঁদের মধ্যে। তারপর লোকটা যে পথে এসেছিল, সেই পথেই ফিরে গেল। লামা রিম্পুচিও ফিরে এসে মঠে ঢুকলেন। একটু পর থেকেই নীচের প্রার্থনাকক্ষ থেকে একটা অস্পষ্ট শব্দ ভেসে আসতে লাগল। জপযন্ত্র ঘোরানোর ঘরঘর ঝুনঝুন শব্দ। নিস্তব্ধ মঠে ওই সামান্য শব্দও ধরা দিতে লাগল সুদীপ্তদের কানে।

লোকটা কে হতে পারে? এত রাতে সে কোথা থেকে কেন লামার সঙ্গে দেখা করতে এল? ব্যাপারটা ঠিক বুঝে উঠতে পারলেন না সুদীপ্তরা। হেরম্যান একসময় বললেন, "এসব ব্যাপার যাই হোক, একটা দিন কিন্তু কেটে গেল, যার সন্ধানে এসেছি, তার কিন্তু কোনও খোঁজ মিলল না। এখনও অন্ধকারেই আমরা আছি।"

বেশ চিন্তান্বিত দেখাল হেরম্যানকে।

সুদীপ্তরা তাকিয়ে রইলেন বাইরের দিকে। চন্দ্রালোকে উদ্ভাসিত বাইরের পৃথিবী। সুদীপ্তর হঠাৎ নজর পড়ল চত্বরের শেষ প্রান্তে সেই দেওয়ালের গায়ের গুহামুখের দিকে। সে বলল, "লামা আমাদের ওই গুহায় ঢুকতে বারণ করলেন, অথচ কাল নিজেই ওই গুহায় ঢুকলেন! ওই গুহায় কোনও রহস্য লুকিয়ে নেই তো?"

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। কিন্তু মুশকিল হল, লামার নির্দেশ অমান্য করে আমরা ওখানে ঢুকছি। তা তিনি বুঝতে পারলে এই মঠ থেকে আমাদের তাড়িয়ে দিতে পারেন। তবে তেমন হলে ওখানে আমরা ঢুকব। কে বলতে পারে ওই গুহাতেই হয়তো আছে সেই প্রাণী। গুহাটার উপর আমাদের নজর রাখতে হবে।"

হেরম্যান আরও কী কথা যেন বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু পাহাড় কাঁপিয়ে বাইরে কোথায় যেন একটা শব্দ হল, 'গুম!'

তারপর রাত্রির নিস্তব্ধতা ভেঙে সে শব্দ এক পাহাড় থেকে অন্য পাহাড়ে প্রতিধ্বনিত হতে লাগল, 'গুম, গুম, গুম, গুম...'

সুদীপ্ত বলল, "ও কীসের শব্দ? কোথাও পাথর ধসে পড়ল নাকি?"

হেরম্যান বললেন, "না, এটা সম্ভবত রাইফেলের শব্দ।"

"রাইফেলের শব্দ?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "তাই মনে হচ্ছে। এমন হতে পারে, চিতাটাকে দেখতে পেয়ে গুলি চালিয়েছেন মিস্টার রাই বা অন্য কেউ।"

সুদীপ্তদের এর পর কানে এল নীচে মঠের দরজা খোলার আওয়াজ। তারা দেখল, সম্ভবত শব্দটা শুনেই আবার বাইরে বেরলেন লামা ডং। কিছুক্ষণ তিনি চুপ করে দাঁড়িয়ে রইলেন চত্বরে। তারপর বেশ দ্রুত হেঁটে চত্বরের শেষ প্রান্তে দেওয়ালের কাছে গিয়ে সেই গুহার ভিতর হারিয়ে গেলেন।

হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "একটু আগে আমরা যেকথা বলছিলাম, হয়তো সেটাই ঠিক। মনে হচ্ছে সত্যিই কোনও রহস্য লুকিয়ে আছে ওই গুহার মধ্যে।"

সুদীপ্তরা দীর্ঘক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সেই গুহার দিকে। লামা কিন্তু আর বাইরে বেরলেন না। হেরম্যান একসময় বললেন, "রাত শেষ হয়ে আসছে। চলুন, এবার শুয়ে পড়া যাক। কাল ব্যাপারটা নিয়ে খোঁজ করা যাবে।"

সুদীপ্তরা শুয়ে পড়তে যাচ্ছিলেন, হঠাৎ হেরম্যান বললেন, "আরে, আবার সেই শব্দটা শুরু হয়েছে না?"

সুদীপ্তরও এবার যেন মনে হল, নীচ থেকে জপযন্ত্র ঘোরানোর ক্ষীণ স্পষ্ট শব্দ কানে আসছে! এটা কি তাদের মনের ভুল? লামা রিম্পুচি কি তবে ফিরে এলেন? কই সুদীপ্তরা তাঁকে ফিরে আসতে দেখল না তো?

সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য সুদীপ্তকে ঘরে বসিয়ে রেখে হেরম্যান ঘর ছেড়ে সন্তর্পণে নীচে নেমে গেলেন। আবার ফিরেও এলেন কিছু সময়ের মধ্যে। তাঁর চোখে-মুখে বিস্ময়ের স্পষ্ট ছাপ। তিনি বললেন, "লামা রিম্পুচি মঠে ফিরে এসে প্রার্থনায় বসেছেন।"

॥ ৭ ॥

শেষ রাতে জানলা বন্ধ করে সুদীপ্তরা ঘুমিয়ে পড়েছিল। উঠতে একটু দেরিই হয়ে গেল তাদের। প্রায় আটটা বাজল। হেরম্যান বললেন, "তাড়াতাড়ি তৈরি হয়ে নিন। বীরবাহাদুরদের সঙ্গে দেখা করতে যাব। দেখি, যদি ওঁরা কাল রাতের ব্যাপারে কোনও আলোকপাত করতে পারেন। তবে বাইরে বেরোবার আগে মঠাধ্যক্ষ ডংয়ের সঙ্গেও একবার দেখা করে যাব।"

কিছুক্ষণের মধ্যেই তারা দু'জন তৈরি হয় নীচে নেমে প্রার্থনাকক্ষের সামনে হাজির হল। লামা খোলা জানলার সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন। সুদীপ্তরা ঘরে পা রাখতেই চমকে উঠে পিছন ফিরলেন। তাঁর মুখ-চোখ আজ যেন অস্বাভাবিক ফোলা-ফোলা লাগছে। সুদীপ্তরা কাছে যেতে একটু আশ্বস্ত হওয়ার ভঙ্গিতে তিনি বললেন, "ও আপনারা! রাত জাগার ফলে ঘুম ভাঙতে দেরি হল বুঝি?"

সুদীপ্তরা অবাক হয়ে গেল তাঁর কথা শুনে। এই দৈবদৃষ্টিসম্পন্ন লামার কাছে ব্যাপারটা আর গোপন করে লাভ নেই বুঝতে পেরে হেরম্যান জবাব দিলেন, "হ্যাঁ।"

জবাব দিয়ে একটু ইতস্তত করে তিনি বললেন, "আচ্ছা, কাল রাতে কী ঘটেছিল, বলুন তো? ওরকম প্রচণ্ড শব্দ! তারপর দেখলাম আপনি ওই গুহাটার দিকে ছুটে গেলেন?"

কয়েক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন, "গুলি চলেছিল। আপনারা তো নিশ্চয়ই ওই দলটার কাছে যাচ্ছেন। রাই বলে লোকটাকে বলে দেবেন, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব এ অঞ্চল ছেড়ে ও যেন চলে যায়। নইলে সে আর ফিরবে না।"

"ফিরবে না মানে?" সুদীপ্ত তাকাল লামা রিম্পুচির মুখের দিকে। তাঁর চোয়াল যেন কঠিন হয়ে উঠেছে, ঠিক সেই মুহূর্তেই সুদীপ্ত একটা ব্যাপার খেয়াল করল, লামার নাকের নীচে রক্তবিন্দু টলটল করছে! সঙ্গে-সঙ্গে সুদীপ্ত বলল, "আপনার নাকে কী হল? চোট লাগল নাকি?"

সঙ্গে-সঙ্গে লামা হাতের চেটোর উলটো পিঠ দিয়ে নাকের রক্ত মুছে নিয়ে বললেন, "ও কিছু না, তবে আমি যে কথা বললাম, সেটা অবশ্যই জানিয়ে দেবেন রাইকে।" লামা এর পর আর কোনও কথা না বলে বুদ্ধমূর্তির সামনে চলে গেলেন।

মঠ থেকে বেরিয়ে হাঁটতে-হাঁটতে হেরম্যান বললেন, "মিস্টার রাই যেমন লামা রিম্পুচির উপর খেপে আছেন, তিনিও তেমনই ওর উপর খাপ্পা। আমার ধারণা, এর পিছনে অন্য কোনও ব্যাপার আছে।"

সুদীপ্ত বলল, "একটা অদ্ভুত ব্যাপার খেয়াল করেছেন, ভোরবেলা

ওঁকে যখনই দেখি, তখনই ওঁর মুখ কেমন যেন অস্বাভাবিক রকম ফোলা মনে হয়। যেন সব রক্ত মুখে গিয়ে জমেছে! পরে আবার স্বাভাবিক হয়ে যায় মুখমণ্ডল। আজ আবার নাকে রক্ত দেখলাম। এটা কি দীর্ঘক্ষণ ধরে এক জায়গায় বসে সাধনা করার ফল?"

হেরম্যান বললেন, "ব্যাপারটা আমিও খেয়াল করেছি। ব্যাপারটা আমারও বোধগম্য হচ্ছে না।"

হেরম্যান এর পর বললেন, "আমাদের হাতে হয়তো আর মাত্র আজ আর কালকের দিনটা আছে। যেভাবেই হোক, এ দু'টো দিন আমাদের কাজে লাগাতে হবে। মঠে ফিরে আবার আমরা ঘরগুলো ভাল করে দেখব।"

সুদীপ্ত হঠাৎ বলল, "একটা ব্যাপারে আমার একটু খটকা লাগছে। কাল ক্রায়োনিক্স-ক্রায়োজেনিক্স বইটা লাইব্রেরিতে রেখে এলাম। সেটা হঠাৎ উবে গেল কী করে? কোনও বিশেষ কারণে লামা সেটা সরিয়ে ফেলেননি তো? আবার বীরবাহাদুরের কাছেও একই বিষয়ের উপর বই। এটা কি কাকতালীয় ব্যাপার? ক্রায়োজেনিক্সের ব্যাপারে আপনার কিছু পড়াশোনা আছে?"

হেরম্যান বললেন, "সাধারণ কিছু তথ্য জানা আছে। এই যেমন ক্রায়োজেনিক্স বা 'হিমবিজ্ঞান' হল পদার্থবিজ্ঞানের এক শাখা। গ্রিক শব্দ থেকে এই শব্দের সৃষ্টি। যার মানে হল 'জমে যাওয়া শীতে তৈরি'। এই বিজ্ঞানের সাহায্যে মারাত্মক শীতল তাপমাত্রা তৈরি হয়। ন্যূনতম তাপমাত্রা হল -১৮০° সেন্টিগ্রেড। এ কাজে মূলত তরল নাইট্রোজেন ও হিলিয়াম ব্যবহার করা হয়। এ দু'টি তরল মারাত্মক ঠান্ডা। তরল নাইট্রোজেনে যদি একটা আঙুরকে চুবিয়ে রাখা যায়, তবে সেটা এত কঠিন হয়ে যাবে যে, একটা হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করলে সেটা টুকরো-টুকরো হয়ে ভেঙে যাবে। ক্রায়োজেনিক্স ব্যাপারটা বর্তমানে পদার্থবিদ্যার সীমানা অতিক্রম করে কৃষিবিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ইত্যাদি বিভিন্ন ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হচ্ছে। অতিনিম্ন তাপমাত্রায় শাকসবজি, ফলমূল, রক্ত-মজ্জা ইত্যাদি সংরক্ষণ করা হচ্ছে। ব্যস, এব্যাপারে আমার জ্ঞানের দৌড় এ পর্যন্তই। তবে তোমার ওই ক্রায়োনিক্স শব্দটা আমি পড়েছিলাম, কিন্তু কিছুতেই মনে করতে পারছি না।"

সুদীপ্তরা কথা বলতে-বলতে নীচে নেমে পৌঁছে গেল বরফসেতুর কাছে। দূর থেকেই দেখতে পেল, এপারে সেতুর মুখে দাঁড়িয়ে আছেন বীরবাহাদুর, রাই, আরও জনাপাঁচেক লোক। তার মধ্যে তিনজন লোক সম্পূর্ণ অচেনা। সুদীপ্তরা তাদের কাছে গিয়ে বুঝতে পারল, সেই অচেনা লোকগুলো কোনও পাহাড়ি উপজাতির লোক হবে। তাদের চেহারা অনেকটা তিব্বতিদের মতো। ছোটখাটো কিন্তু শক্তপোক্ত গড়ন, পায়ে হাইহিল কাঁটা লাগানো জুতো, মাথা থেকে পা পর্যন্ত ঢাকা ঘরে বানানো ভেড়ার চামড়ার জ্যাকেট। একজনের কাঁধে একটা গাদা বন্দুকও আছে।

তাদের কাছে পৌঁছে লোকগুলোকে দেখিয়ে হেরম্যান বললেন, "এরা?"

রাই দাঁত বের করে হেসে বললেন, "ওরা ওই পাহাড়ের ওপাশের উপত্যকায় থাকে। একবার ওখানে ক্র্যাশ ল্যান্ডিং করতে হয়েছিল, সে সময় ওদের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়। ওরা এখানে পাহাড়ি ছাগল শিকার করতে আসে। কাল রাতে গুলির শব্দ পেয়ে ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে বেরোয়। আমার সঙ্গে ওদের দেখা হয়ে গেল।"

সুদীপ্তর মনে পড়ে গেল গত কাল মঠে ফেরার পথে দেখা সেই পায়ের ছাপগুলোর কথা। সে ছাপগুলো তা হলে এই লোকগুলোরও হতে পারে।

হেরম্যান বললেন, "কিন্তু কাল গুলিটা চালাল কে?"

বীরবাহাদুর বললেন, "কাল রাতে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছে। রাত তখন প্রায় তিনটে হবে। আমরা সবাই ঘুমোচ্ছিলাম। ছেত্রী নামের এই ফরেস্ট গার্ড শুধু তাঁবুর বাইরে পাহারায় ছিল। বরফ সেতুর উপর হঠাৎ সে দেখতে পায় চিতাবাঘটাকে। প্রাণীটা এদিক থেকে সেতু পেরিয়ে আমাদের তাঁবুর দিকে যাচ্ছিল। বাঘটা ওর রাইফেলের পাল্লার মধ্যে আসতেই গুলি চালায় ও। প্রাণীটা গুলি খেয়ে সেতুর উপর থেকে প্রায় একশো ফুট নীচে একটা তাকে পড়ে যায়। আমরা সবাই গুলির শব্দ পেয়ে বাইরে বেরিয়ে আসি। কিন্তু অত রাতে নীচে নামা সম্ভব ছিল না। সকালবেলা আমরা নীচে নামলাম, কিন্তু সেই প্রাণীর দেহটা সেখানে নেই!"

সুদীপ্ত বলল, "প্রাণীটা গুলি খেয়ে ঠিক তাকে পড়েছিল তো?"

বীরবাহাদুরের পাশে দাঁড়ানো ছেত্রী নামের মাঝবয়সি ফরেস্ট গার্ড বলে উঠল, "হ্যাঁ, সাহেব, প্রাণীটা ঠিক নীচে পড়েছিল। রক্তের চিহ্নও সেখানে আছে। সাহেবরা নীচে নেমে দেখেছেন।"

হেরম্যান বললেন, "এমন হতে পারে প্রাণীটার চোট তেমন কিছু মারাত্মক ছিল না। পড়ে যাওয়ার পর চোট সামলে উঠে প্রাণীটা পালিয়েছে।"

মিস্টার রাই এবার বললেন, "হ্যাঁ, ব্যাপারটা তেমন হতেই পারে, কিন্তু সম্ভবত তা নয়। কারণ..." একটা অদ্ভুত হাসি ফুটে উঠল রাইয়ের মুখে?

"কী কারণ?" একসঙ্গে প্রশ্ন করলেন সুদীপ্ত-হেরম্যান।

বীরবাহাদুর সম্ভবত কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু রাই তাঁকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "ব্যাপারটা ওঁদের মুখে না বলে চোখে দেখানোই ভাল। আবার সেতুর নীচে নামব আমরা।"

কৌতূহল নিয়ে তাঁদের পিছন-পিছন সেতুতে উঠল সুদীপ্তরা। সেতুর মাঝামাঝি জায়গা থেকে আরও কিছুটা এগিয়ে এক জায়গায় থামল সকলে। কিছুটা তফাতে একটা খাড়া পাথরের দেওয়াল থেকে আন্দাজ একশো ফুট নীচে একটা তাক বেরিয়ে আছে। রোপ টাঙানো হল সেতুতে পিট্টু অর্থাৎ লোহার পেরেক পুঁতে। দু'জন শেরপা প্রথমে দড়ি ধরে সেই তাকে নামল। কিছুক্ষণের মধ্যেই সেতু থেকে তাকে পৌঁছনোর জন্য তৈরি হয়ে গেল একটা ঝুলন্ত রাস্তা। পিঠে হুক আটকে বীরবাহাদুর, রাই, সুদীপ্ত, হেরম্যানকে একে-একে সেই তাকে নামিয়ে দিল শেরপারা। সকলে নীচে নামার পর রাই কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে একটা জায়গা দেখিয়ে বললেন, "প্রাণীটা যে নীচে পড়েছিল, তার প্রমাণ ওই যে বরফে জমাট বাঁধা রক্ত। আর তার পাশে ওই যে..."

"ওই যে কী?"

ভাল করে সে জায়গায় তাকাতেই চমকে উঠল সুদীপ্তরা। রক্তের দাগের পাশেই বরফের উপর আঁকা হয়ে আছে বেশ বড় কয়েকটা পায়ের ছাপ! সুদীপ্ত আর হেরম্যান তাড়াতাড়ি এগিয়ে গিয়ে ঝুঁকে পড়ল সেই ছাপগুলোর উপর। ছাপগুলো একটু পরীক্ষা করার পর সেগুলো যে ধোঁকা নয়, তা বুঝতে পেরে উজ্জ্বল হয়ে উঠল হেরম্যানের মুখ। পকেট থেকে তিনি একটা মাপার ফিতে বের করলেন। সুদীপ্ত দেখতে পেল ফিতে দিয়ে ছাপ মাপার সময় উত্তেজনায় হেরম্যানের হাত কাঁপছে। ছাপ মেপে উঠে দাঁড়িয়ে হেরম্যান বললেন, "সাড়ে এগারো ইঞ্চি! কোনও জ্যান্ত মানুষের পায়ের ছাপ এত বড় হতে পারে না! আছে! সে অবশ্যই আছে!"

মিস্টার রাই বলে উঠলেন, "হ্যাঁ, আমার ধারণা প্রাণীটা অবশ্যই আছে। আমার কথা সেদিন কেউ বিশ্বাস করেনি, সবাই ওই শয়তান লামাটার কথাই বিশ্বাস করল। এবার তার প্রমাণ পাওয়া গেল তো? আমার ধারণা তুষারচিতাটাকে ওই দানব প্রাণীটাই তুলে নিয়ে গিয়েছে এবং সে ওই মঠেই গিয়েছে। বন্দুকের নলের সামনে দাঁড় করালে বুড়োটা সব সত্যি কথা বলবে। ও জানে, ওরা কোথায় আছে। এখনই ওই মঠে যাওয়া দরকার।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে মৃদু প্রতিবাদ করে বললেন, "কিন্তু কোনও প্রমাণ ছাড়া শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে লামার কাছে কৈফিয়ত চাওয়া কি ঠিক হবে? তা ছাড়া মঠে তল্লাসি চালাবার জন্য সরকারি অনুমতিপত্রের প্রয়োজন হয়, সেটা আমার কাছে নেই। কাজটা বেআইনি হবে।"

মিস্টার রাই বললেন, "আরে, রাখো তোমার বেআইনি কাজ! যেখানে কোনও মানুষ থাকে না, সেখানে আবার আইন-বেআইন

কী?"

সুদীপ্তর এবার সেই কথাটা মনে পড়ে গেল, যা লামা ডং রিম্পুচি বলতে বলেছেন মিস্টার রাইকে।

সুদীপ্ত এবার একটু ইতস্তত করে রাইকে বলল, "আপনাকে একটা কথা লামা জানাতে বলেছেন। তিনি বলেছেন, আপনি এ অঞ্চল থেকে তাড়াতাড়ি না চলে গেলে আপনার বিপদ হবে।"

সুদীপ্তর কথা শোনা মাত্রই লাল হয়ে উঠল মিস্টার রাইয়ের মুখ। ক্রোধে ফেটে পড়তে গিয়েও নিজেকে সামলে নিয়ে অট্টহাস্য করে উঠে বললেন, "বিপদ হবে! ওই হাড়গিলে লামাটারই বরং বিপদ আসছে, এখন তো দেখছি ওখানে আমাকে যেতেই হবে," এ কথা বলে তিনি বীরবাহাদুরের দিকে তাকিয়ে বললেন, "তোমরা না গেলে আমি একলাই যাব।"

মিস্টার রাই লামার উপর এমন খেপে আছেন যে, তাঁকে একা মঠে যেতে দিলে অপ্রীতিকর কোনও ব্যাপার ঘটতে পারে, এমন আঁচ করেই সম্ভবত বীরবাহাদুর বললেন, "ঠিক আছে, তবে লামার কাছে সকলে মিলে গিয়ে একবার কথা বলে নেওয়া যেতে পারে।"

এসব কথাবার্তার মাঝেই হেরম্যানের চোখ ঘুরছিল চারপাশে। হঠাৎ তিনি তাকের গায়ের পাথুরে দেওয়ালের গা থেকে কী যেন একটা জিনিস তুলে নিয়ে হাতের চেটোয় রেখে বললেন, "যার পায়ের ছাপ রয়েছে, সেই প্রাণীটা সম্ভবত এই দেওয়াল বেয়েই তাকে ওঠা-নামা করেছিল। বানর শ্রেণির প্রাণী ছাড়া অন্য কোনও চতুষ্পদ প্রাণীর এই খাড়া দেওয়াল বেয়ে ওঠা-নামা সম্ভব নয়। এই দেখুন, হেরম্যান তাঁর হাতের তালুটা মেলে ধরলেন। তাঁর তালুতে এক গোছা ঘন বাদামি লম্বা লোম!

মিস্টার রাই লোমগুলো হাতে নিয়ে একবার পরীক্ষা করে বললেন, "না, এটা তুষারচিতার লোম নয়, সম্ভবত সেই প্রাণীরই হবে, যাকে আমি দেখেছিলাম।"

হেরম্যান একটা কাগজে লোমগুলোকে সযত্নে মুড়ে নিজের পকেটে রাখলেন।

সুদীপ্তরা একে-একে এর পর আবার দড়ি বেয়ে সেতুর উপরে উঠে এলেন। তারপর সকলে মিলে রওনা হলেন মিগু গুম্ফার দিকে। বীরবাহাদুর আর রাইরা আগে-আগে চলেছেন। কিছুটা তফাতে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। চলতে-চলতে হেরম্যান চাপা স্বরে সুদীপ্তকে বললেন, "দেখুন, লামা আমাদের মঠে আশ্রয় দিয়েছেন। আমাদের সঙ্গে উনি কোনও অভব্য আচরণ করেননি। তিনি বৃদ্ধ মানুষ। রাইয়ের সঙ্গে তাঁর ব্যক্তিগত মনোমালিন্য থাকতে পারে, কিন্তু আমাদের সঙ্গে নেই। বুড়ো লোকটার সঙ্গে এত লোক মিলে যদি কোনও খারাপ আচরণ করেন, সে ক্ষেত্রে কিন্তু আমাদের লামার পাশেই দাঁড়ানো উচিত। আপনি কী বলেন?"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, আমার মতও তাই। তবে আমার মনে হয়, লামা রিম্পুচি ও মিস্টার রাইয়ের মধ্যে গন্ডগোলটা নিছকই প্রাণীটার উপস্থিতি লামা অস্বীকার করেছেন বলে নয়, এর পিছনে অন্য কোনও কারণ আছে।"

হেরম্যান বললেন, "হতে পারে, তবে কোনও পক্ষেরই কোনও বেআইনি কাজে আমরা সামিল হব না।"

আকাশে আবার একটা ঘোলাটে ভাব দেখা দিয়েছে। তুষারপাতের পূর্বাভাস। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, "তবে একটা ব্যাপার, প্রাণীটার উপস্থিতির ব্যাপারে রাই সম্ভবত যে মিথ্যা বলেননি, তার প্রমাণ কিন্তু আমরা একটু আগে নিজের চোখেই দেখলাম।"

[illegible]

অপেক্ষা করি। দরজা কখন খোলে দেখি, ওর সঙ্গে আমি একটা শেষ বোঝাপড়া করব।"

চত্বরটায় ঘুরে বেড়াতে লাগল সকলে। হঠাৎ মিস্টার রাইয়ের নজর গেল গুহাটার দিকে। কৌতূহলবশত তিনি এগিয়ে গেলেন গুহার দিকে, তারপর বলে উঠলেন, "আরে, এর ভিতর তো মানুষ যাওয়া-আসা করে। পায়ের ছাপ রয়েছে, খালি পায়ের ছাপ। সম্ভবত বুড়ো লামাটারই ছাপ!"

সুদীপ্তও এগিয়ে গেল গুহামুখের কাছে। রাই হেরম্যানকে বললেন, "আপনারা এ গুহাটায় লামাকে ঢুকতে দেখেছেন?"

হেরম্যান কোনও জবাব দিলেন না। তাঁকে নিশ্চুপ দেখে রাই বললেন, "বুঝেছি, এ গুহাটার ভিতর কী আছে, একবার ঢুকে দেখতে হবে।" এই বলে কাঁধ থেকে রাইফেল খুলে নিয়ে রাই গুহার ভিতর পা রাখতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু ঠিক সেই সময় সেই পাহাড়ি উপজাতি লোকগুলোর একজন তাঁকে বলল, "মালিক, এ গুহার কথা আমি শুনেছি। এর নাম 'মিগু গুহা'। গুম্ফার নামও এ গুহা থেকেই হয়েছে। এ গুহায় ঢুকলে কেউ নাকি ফেরে না। ভিতরে আপনার চট করে ঢোকা ঠিক হবে না, তার বদলে..." এই বলে সে ইশারা করল কিছু দূরে বীরবাহাদুর আর তাঁর সঙ্গে দাঁড়িয়ে থাকা আর দু'জন লোকের দিকে। রাই হাঁক দিলেন তাঁদের। বীরবাহাদুর তাঁদের নিয়ে গুহার কাছে এলেন। হেরম্যানও উপস্থিত হলেন সেখানে। রাই বললেন, "এ গুহার ভিতরে লোকের আনাগোনা আছে। ভিতরে কী আছে দেখতে হবে। কে যাবে ভিতরে?"

যে লোকটা গত রাতে চিতাটাকে গুলি চালিয়েছিল, সে লোকটা সম্ভবত একটু ডাকাবুকো ধরনের। সে এগিয়ে এসে বলল, "আমি যাব।"

তুষারপাত আরও জোরে শুরু হয়েছে, তার সঙ্গে কনকনে ঠান্ডা বাতাস। বীরবাহাদুর বললেন, "যা করার তাড়াতাড়ি করতে হবে। যা অবস্থা তাতে সেতু পেরিয়ে এর পর আর ফেরা যাবে না।"

লোকটার কোমরে দড়ি বাঁধা হল। কারণ, এসব গুহায় অনেক সময় গর্ত থাকে। তাতে পড়ে গেলে যাতে টেনে তোলা যায় তাই এই ব্যবস্থা। এক হাতে টর্চ আর অন্য হাতে রাইফেল নিয়ে গুহার ভিতর ঢুকল লোকটা। একজন লোক শক্ত নাইলনের দড়ি ধরে বাইরে দাঁড়াল। সুদীপ্তরাও সকলে বাইরে দাঁড়িয়ে রইলেন। আকাশ থেকে তুলোর মতো নেমে আসা তুষারে ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছে সকলের সর্বাঙ্গ। লোকটা ভিতরে এক পা, এক পা করে এগোচ্ছে। সরসর শব্দে সরে যাচ্ছে বাইরের লোকটার হাতে ধরা নাইলনের দড়িটা। পঞ্চাশ ফুট মতো দড়ি সরে যাওয়ার পর রাই বাইরে থেকে একবার হাঁক দিলেন লোকটার উদ্দেশে, "সব ঠিক আছে?"

"ঠিক আছে," লোকটার কণ্ঠস্বর এল গুহার ভিতর থেকে।

খুব ধীরে দড়ি সরছে। লোকটা এগোতে-এগোতে মাঝে-মাঝে মনে হয় থামছে। বাইরে দাঁড়িয়ে সুদীপ্তরা। হেরম্যান একসময় মন্তব্য করলেন, "এসব গুহা অনেক সময় কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত হয়।"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে কী যেন একটা মন্তব্য করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই সময় একটা ক্ষীণ আর্তনাদের শব্দ যেন ভেসে এল গুহার অন্ধকার থেকে। দড়িটা হাত থেকে এক ঝটকায় ফুটখানেক এগিয়েই থেমে গেল। কী হল? লোকটার নাম ধরে ডাকতে লাগলেন অন্যরা। কিন্তু কোনও সাড়া মিলল না, দড়িটাও আর সরছে না!

বীরবাহাদুর বলে উঠলেন, "দড়িতে টান দাও। নিশ্চয়ই কিছু

[illegible]

তার। পৃথিবীর এক মুঠো বাতাস নেবার জন্য সে একবার মুখটা হাঁ করল, তারপর কাটা কলাগাছের মতো মাটিতে পড়ে গিয়ে খাবি খেতে লাগল! বীরবাহাদুর সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, "ওকে এখনই তাঁবুতে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে। তাঁবুতে অক্সিজেন সিলিন্ডার আছে, অক্সিজেন দিতে হবে। নইলে লোকটা বাঁচবে না।"

রাই যেন কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু বীরবাহাদুর এক ধমকে তাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "এখন আর কোনও কথা নয়, তাড়াতাড়ি লোকটাকে তোলো।"

এ কথা বলে তিনি হেরম্যানকে বললেন, "আপনারা এখন কী করবেন?"

সুদীপ্তরা কী করবে বুঝে উঠতে পারছেন না। তাদের তাঁবু, জিনিসপত্র সব মঠের ভিতর। দু'জন শেরপা ইতিমধ্যে ধরাধরি করে উঠিয়ে নিয়েছে সংজ্ঞাহীন শিকারিকে। তাঁদের কোলে শোওয়া লোকটার হাত দু'টো দেহের দু'পাশে ঝুলছে। হঠাৎ তার ঝুলন্ত ডান হাতের মুঠো খুলে গেল। আর তার হাতের মুঠো থেকে বরফের উপর খসে পড়ল কী একটা, সুদীপ্ত কুড়িয়ে নিল সেটা। এক গোছা ঘন বাদামি লোম!

॥ ৮ ॥

দলটা রওনা হয়ে গেল। সুদীপ্তরা তখনও একই জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। লোকটার হাত থেকে খসে পড়া লোমের ব্যাপারটা সম্ভবত খেয়াল করেননি অন্যরা বা খেয়াল করলেও পরিস্থিতির বিচারে তেমন গুরুত্ব দেননি। হেরম্যান পকেট থেকে কাগজের মোড়কটা বের করে তার ভিতরের লোমগুলোর সঙ্গে সদ্য পাওয়া লোমগুলোকে মিলিয়ে দেখে বললেন, "একই লোম। প্রাণীটা কি তা হলে এই গুহায়ই থাকে? আর এ ব্যাপারটা যদি সত্যি হয় তবে লামা নিশ্চিত ভাবেই ব্যাপারটা জানেন।"

সুদীপ্ত বলল, "সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। কিন্তু এখন কী করবেন বলুন? লামা কি মঠ ছেড়ে চলে গেলেন? তা হলে তো এখানে থাকলে সারা রাত আমাদের বাইরেই কাটাতে হবে।"

সুদীপ্ত আর হেরম্যান চোর্তেনের নীচে আশ্রয় নিয়ে কী করবে আলোচনা করতে লাগলেন।

তুষারপাত এক সময় কমে এল, আকাশের ঘোলাটে ভাবটা কেটে গিয়ে পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি মারতে লাগল সূর্য। পাহাড়ের আবহাওয়ার মতিগতি বোঝা ভার! তবে তুষারপাত বন্ধ হয়ে সূর্য মুখ দেখাতেই কিছুটা উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন দু'জনেই। হেরম্যান বললেন, "চলুন, একটা কাজ করা যাক। আমরা এখন বীরবাহাদুরদের তাঁবুতে যাই। দেখি যদি যে লোকটা গুহায় ঢুকেছিল, সে যদি জ্ঞান ফিরে কিছু বলতে পারে! তারপর আমরা আবার এখানে ফিরে আসব, অথবা পরিস্থিতি অনুযায়ী ব্যবস্থা নেব।"

সুদীপ্তরা রওনা হল বীরবাহাদুরদের তাঁবুর দিকে। তুষারপাত বন্ধ হলেও কনকনে ঠান্ডা বাতাস বইছে তখনও। সদ্য পড়া তুষারে সুদীপ্তদের কাঁটা লাগানো জুতোর গোড়ালি পর্যন্ত বসে যাচ্ছে। ধীর গতিতে হাঁটতে হচ্ছে তাদের। বেশ ধীর গতিতে চলতে-চলতে একসময় বরফ সেতুর প্রায় কাছাকাছি চলে এল তারা। একটা বাঁক, তারপরই সেতুতে ওঠার রাস্তা। হঠাৎ বাঁকের মুখে অস্পষ্ট কথাবার্তার শব্দ শুনতেই থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল তারা। সুদীপ্ত উঁকি দিয়ে দেখল, তাদের কয়েক হাত তফাতেই বাঁকের ওপাশে পাথরের চাতালের উপর দাঁড়িয়ে কথা বলছেন রাই আর বীরবাহাদুর। রাই বেশ উত্তেজিত ভাবে বীরবাহাদুরকে বলছেন, "তোমার কি মাথা খারাপ হয়েছে? চিতাটাকে আমরা না মেরেই চলে যাব। ওটাকে মারতে পারলে সরকার থেকে পুরো দু' লাখ টাকা পুরস্কার পাওয়া যাবে। আমার এখন খুব টাকার প্রয়োজন।"

বীরবাহাদুর বললেন, "আমার ধারণা চিতাটা মারা গিয়েছে।"

রাই বেশ জোর গলায় বললেন, "বলছি তো চিতাটা মরেনি। গুলিতে সামান্য চোট খেয়েছে মাত্র। তারপর প্রাণীটা ওকে নিরাপদ জায়গায় তুলে নিয়ে যায়। বলছি তো একটু আগে আমরা যে প্রাণীটার চিৎকার শুনলাম, সেটা ওরই গর্জন। প্রাণীটা খেপে গিয়েছে, ও আবার হানা দেবে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "সে যাই হোক, প্রাণীটা বেঁচে থাক বা মরে যাক। কাল ভোরেই আমি ফিরে যাব এখান থেকে। দরকার হলে ক'দিন পর আবার আসব।"

রাই বললেন, "চলে যাব? তোমার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। তা হলে বরং তোমার থেকে ধার বাবদ যে তিন লাখ টাকা পাই, সেটা নীচে নেমেই আমাকে ফেরত দিও।"

বীরবাহাদুর কথাটা শুনে একটু নরম ভাবে বললেন, "টাকাটা আমার কাছে থাকলে নিশ্চয়ই ফেরত দিতাম। আর ক'টা দিন সবুর করো, পেয়ে যাবে।"

রাই বললেন, "সবুর করতে-করতে তো তিন বছর কেটে গেল। চিতাটা মারতে পারলেও তো কিছু সুবিধে হত। বাজারে আমারও অনেক ধার। আমাকেও সেগুলো শোধ দিতে হবে। তোমার অবস্থা খারাপ দেখে আমি তোমাকে টাকা দিয়ে সাহায্য করেছিলাম। এখন আমার খারাপ অবস্থা।"

হেরম্যান আর সুদীপ্ত শুনতে লাগল তাঁদের কথোপকথন।

বীরবাহাদুর জবাবে বললেন, "তোমার পাশেও তো আমি থাকার চেষ্টা করছি। তোমার সম্বন্ধে বাজারে, ফরেস্ট ডিপার্টমেন্টের লোকেদের মধ্যে নানারকম কানাঘুষো শোনা যায়। তবুও আমি উপরওলাদের বোঝালাম যে, বাঘটাকে মারতে হলে বা ভবিষ্যতে এ ধরনের কোনও প্রাণীকে কোনও কারণে মারতে হলে তোমার মতো দক্ষ শিকারিই দরকার। তোমার চাকরির তো একটা ব্যবস্থা হল।"

রাই তাঁর কাঁধের বন্দুকটা হাতে নিয়ে নাচাতে-নাচাতে বললেন, "এই অস্থায়ী চাকরিতে আর ক' পয়সা পাব? চিতাটাকে না মারতে পারলে কোনও লাভ নেই।'

বীরবাহাদুর তাঁকে যেন আশ্বস্ত করার জন্য বললেন, "চিতওয়ানে একটা হাতি খেপে গিয়েছে। তিনজন মানুষকে মেরেছে হাতিটা। গভর্নমেন্ট হাতিটাকে 'রোগ' ডিক্লেয়ার করতে চলেছে। ওকে মারার জন্যও এর মধ্যেই একজন শিকারির দরকার হবে। আমি উপরওলাদের বলে তোমাকে কাজটা দেবার চেষ্টা করব। বেশ টাকা পাবে।"

রাই ব্যঙ্গোক্তি করে বললেন, "হাতিটাকে মারার দরকার কী আছে? ওকে বরং তোমার চিতওয়ানের বাড়িতে ঘুম পাড়িয়ে রাখো। তোমার বাড়ির বাঁদর, কুকুর আর খরগোশগুলোর মতো ওদেরও আর ঘুম ভাঙবে না। হাতি মারার টাকাটা তুমিই পেয়ে যাবে।"

রাইয়ের এ কথাগুলোর অর্থ অবশ্য বুঝতে পারল না সুদীপ্ত বা হেরম্যান।

রাই এর পর বেশ কর্কশ ভাবে বললেন, "ওসব হাতির গল্প ছাড়ো! হয় নীচে নেমে টাকা ফেরত দাও, আর নয় চিতাটাকে না মারা পর্যন্ত এখানেই থাকব। তোমাকে টাকাটা দেওয়া তখনই আমার ভুল হয়েছে। তোমার ওই ঠান্ডা ঘরে আমার টাকা আর ফেলে রাখতে পারব না। যত সব হাবিজাবি কাজের পিছনে টাকা নষ্ট করলে তুমি!"

বীরবাহাদুর তাঁর কথা শুনে বললেন, "যে ব্যাপারে তুমি বোঝো না, সে ব্যাপার কথা বোলো না। টাকাটা আমি তোমার মতো কাঠমান্ডুতে জুয়া বা বাজে নেশায় নষ্ট করিনি, বিজ্ঞানসাধনার কাজে লাগিয়েছি। যে সাধনার কাছে টাকা-পয়সা তুচ্ছ। এর জন্য অনেক পড়াশোনা করতে হয়। জানো, আমার প্রপিতামহ দুর্গাবাহাদুর ঘর ছাড়ার আগে রানার দেওয়া হিরেটা আমার ঠাকুরদার হাতে দিয়ে কি বলেছিলেন? বলেছিলেন, 'হিরের চেয়ে পুঁথিপত্তর দামি জিনিস। তাই তোদের কম দামি জিনিসটা দিয়ে আমি বেশি দামি এই পুঁথিটা নিয়ে গেলাম।' পঞ্চাশ-ষাট বছর আগে আমার বাবা সেই হিরে বিক্রি করেন পাঁচ লাখ টাকায়। কিন্তু দুর্গাবাহাদুরের কাছে তা ছিল মূল্যহীন। তাঁর রক্তই তো বইছে আমার ধমনীতে।"

রাই আবার ব্যঙ্গের স্বরে বলে উঠলেন, "তা তোমার ঠাকুরদা

হিরের বদলে পুঁথিটাই রাখতে পারতেন, যখন সেটা অত দামি ছিল!"

বীরবাহাদুর বললেন, "আমি হলে হয়তো সেটাই করতাম। কিন্তু আমার ঠাকুরদা ছিলেন বৈষয়িক মানুষ, তাঁর কাছে হিরেটাই দামি ছিল। তবে পুঁথির ক'টা পাতা আমাদের বাড়িতেই রয়ে গিয়েছিল। আমার বাবা তখন খুব ছোট। আমার পিতামহ আর প্রপিতামহের কথা শুনে শিশুসুলভ ভাবনায় তাঁর মনে হয়, হিরের চেয়ে পুঁথিগুলো যখন দামি, তখন ক'টা পাতা সরিয়ে রাখা যাক। তাই প্রপিতামহের অগোচরে ক'টা পাতা সরিয়ে ফেলেছিলেন তিনি। পরে অবশ্য তিনি ওই ব্যাপারটা নিয়ে হাসাহাসি করতেন। কিন্তু ওই পাতাগুলোই..." কী একটা বলতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন বীরবাহাদুর।

রাই শুনে বললেন, "এসব শুনতে আর ভাল লাগছে না। আচ্ছা, তোমার কাছে আমার একটা ব্যাপার জানার আছে। কাল রাতে তুমি কোথায় বেরিয়েছিলে বলো তো? অন্যরা খেয়াল না করলেও আমি বরফসেতুর উপর তোমার পায়ের ছাপ দেখেছি। যে ছাপ অনুসরণ করেই চিতাটা ওপাশে যাচ্ছিল।"

বীরবাহাদুর এবার যেন একটু থতমত খেয়ে বললেন, "হ্যাঁ, বেরিয়েছিলাম। রাতে ঘুম আসছে না দেখে একটু বাইরে বেরিয়েছিলাম।"

বীরবাহাদুরের জবাব শুনে একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল রাইয়ের মুখে। যে হাসি বুঝিয়ে দিল, তাঁর কথা মোটেই বিশ্বাস করছেন না রাই।

বীরবাহাদুর এর পর বললেন, "আমরা অনেকক্ষণ এখানে দাঁড়িয়ে আছি, এবার চলো। অন্যরা এতক্ষণে তাঁবুতে পৌঁছে গিয়েছে। তবে আমি কিন্তু সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করছি না। কাল ভোরে এ তল্লাট ছেড়ে চলে যাব আমরা। এটাই শেষ কথা। তবে তোমার হাতে আজ রাতটা তো রইল। দ্যাখো, প্রাণীটাকে মারতে পার কিনা?"

রাই একথা শুনে বললেন, "তা হলে চিতাটার জন্য টোপের ব্যবস্থা করতে হবে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "সে যা ব্যবস্থা করার করো।" এই বলে তিনি হাঁটতে শুরু করলেন বরফসেতুর দিকে।

সুদীপ্ত দেখতে পেল, রাইয়ের মুখে এবার কেমন যেন দুর্বোধ্য হাসি ফুটে উঠল। কী একটা ভেবে নিয়ে নিঃশব্দে হেসে তিনি বীরবাহাদুরকে অনুসরণ করলেন। সুদীপ্ত রাই আর বীরবাহাদুরের মধ্যে কথাবার্তা তর্জমা করে দিল হেরম্যানকে। সুদীপ্তরা তাঁদের কথাবার্তা এতক্ষণ ধরে শুনছিল। তারা এবার বাইরে বেরিয়ে এলেন। রাই আর বীরবাহাদুর তখন সেতু পেরোচ্ছেন। সুদীপ্তরাও এগোল সেতুর দিকে। যেতে-যেতে হেরম্যান বললেন, "রাই আর বীরবাহাদুরের কথাগুলোর মধ্যে অন্য একটা ব্যাপারেরও ইঙ্গিত ফুটে উঠেছে বলে মনে হচ্ছে," শুধু একথাটা বলে লম্বা-লম্বা পা ফেলে হাঁটতে শুরু করলেন হেরম্যান।

সুদীপ্তরা যখন সেতু পেরিয়ে তাঁবুর কাছে ফিরল, তখন একটা তাঁবুর সামনে সেই লোকটাকে ঘিরে গোল হয়ে দাঁড়িয়ে আছেন সকলে। মাটিতে শুইয়ে রাখা হয়েছে লোকটাকে। অক্সিজেন মাস্ক পরানো আছে তার মুখে। মাঝে-মাঝে চোখ খুলছে লোকটা। আর মাস্ক পরানো অবস্থাতেই বিস্ফারিত চোখে একটা অদ্ভুত শব্দ করছে, "গ্যা-গ্যা-গ্যা-গ্যা..."

শেরপাদের মধ্যেও একটা মৃদু গুঞ্জন শুরু হয়েছে। আতঙ্কের স্পষ্ট ভাব ফুটে উঠেছে তাদের মুখে। সুদীপ্তরা সেখানে দাঁড়ানোর পর বীরবাহাদুর বললেন, "শেরপারা আর কিছুতেই এখানে থাকতে চাইছে না। এ লোকটার অবস্থা দেখে ওরা আতঙ্কিত। সকালবেলা ওই বিরাট পায়ের ছাপ দেখে ওদের মধ্যে এমনি একটু অস্বস্তি হয়েছিল। এখন ওদের ধারণা হয়েছে, ওই গুহাটা নাকি এই তুষারদেশের রাজার গুহা। রাজার গুহায় অনধিকার প্রবেশের শাস্তি পাচ্ছে এ লোকটা। আজ রাতে এখানে থাকলে নাকি তাদের ক্ষতি হবে। সূর্য ডুবতে আরও ঘণ্টাচারেক বাকি আছে। তার মধ্যেই ওরা নীচে নেমে যাবে, বলছে। নীচে মানে, হাজার দুই ফুট নীচে যে ছোট উপত্যকা আছে সেখানে।"

একথাগুলো বলে তিনি রাইকে বললেন, "তোমার কী মত?"

রাই বেশ অসন্তুষ্ট ভাবে বললেন, "তুমি কিন্তু আমাকে কথা

দিয়েছিলে যে, আজ রাত পর্যন্ত চিতাটা মারার সুযোগ দেবে। সেই পাহাড়ি লোক দু'টোকে আমি পাঠিয়েছি চিতাটার খোঁজ কোথাও পাওয়া যায় কিনা তা অনুসন্ধান করতে। আজ রাতটা অন্তত এখানে থাকতেই হবে।"

ঠিক এই সময়ে শেরপাদের যে দলপতি, সে রাইয়ের কথা শুনে বেশ ঝাঁঝের সঙ্গে বলে উঠল, "আপনাদের এখানে থাকতে ইচ্ছে হয় থাকুন সাহেব। আমরা থাকব না। রাজা রেগে গিয়েছেন। এ লোকের কী অবস্থা হল দেখতেই পাচ্ছেন। ও চিতাটা রাজার পোষা। ওকে গুলি করা ঠিক হয়নি। রাজা যদি সশরীরে তাঁবুতে এসে উপস্থিত হন, তবে আপনাদের রাইফেল তাঁকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবে না। তাঁর পায়ের ছাপ যখন দেখা গিয়েছে, তখন তিনি কাছেই আছেন।"

বীরবাহাদুর বললেন, "তা হলে একটা কাজ করা যাক রাই। একটা তাঁবু রেখে যাচ্ছি, তুমি বরং রাতটা এখানেই কাটাও। আমি এদের নিয়ে নীচে যাচ্ছি। কাল সকালে তুমি নীচে গেলে তারপর ফেরার পথ ধরব আমরা।"

রাই কয়েক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে বললেন, "ঠিক আছে। এ প্রস্তাবে আমার আপত্তি নেই।"

বীরবাহাদুর এর পর সুদীপ্তদের জিজ্ঞেস করলেন, "আপনারা কী করবেন?"

হেরম্যান বললেন, "আমরা থাকব। আমাদের সব জিনিসপত্র তো মঠে পড়ে আছে।"

বীরবাহাদুর বললেন, "রাই আর তার দু'জন লোক তো রইলই, আপনারাও রইলেন। ভালই হল, কোনও অসুবিধে হলে একপক্ষ অপর পক্ষকে সাহায্য করতে পারবেন।"

বীরবাহাদুর এবার তাঁবু গোটানোর তোড়জোড় শুরু করলেন। রাই বললেন, "আমিও তাঁবুটা তুলে নিয়ে সেতুর ওপাশে যাব। চিতাটা তো ও পাশেই আছে," তিনিও লেগে গেলেন তাঁবু গোটানোর কাজে।

কিছুক্ষণের মধ্যেই বীরবাহাদুর তৈরি হয়ে গেলেন। বিদায় নেওয়ার জন্য তিনি করমর্দনের হাত বাড়িয়ে দিয়ে বললেন, "চলি তা হলে, আবার হয়তো কাল অথবা বেসক্যাম্পে দেখা হবে।"

হেরম্যান তাঁর হাত ধরে বললেন, "আপনি যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটা প্রশ্ন আছে। সেতুর নীচে সেই তাকটাতে আমরা যার পায়ের ছাপ দেখলাম, দেওয়ালের গায়ে যার লোম পেলাম, সে সম্বন্ধে আপনাদের মতামত কী? এ ব্যাপারটা তো মনে ঝড় তোলার মতো ব্যাপার! যার খোঁজে হিলারি-নোরগের মতো বিখ্যাত মানুষরাও একদিন হিমালয়ে এসেছিলেন, তার উপস্থিতির প্রমাণ পেয়েও আপনি বা মিস্টার রাই এত নিস্পৃহ কেন? অন্য কেউ হলে তো ওই চিতার ব্যাপার ছেড়ে ওই বিশেষ প্রাণীটার ব্যাপারেই অনুসন্ধান চালাত। অথচ আপনি সব কিছু ছেড়ে চলে যাচ্ছেন?"

অস্পষ্ট একটা হাসির রেখা ফুটে উঠল বীরবাহাদুরের মুখে। রাই কিছু দূরে তাঁবুর দড়িদড়া গুটোচ্ছেন, সেদিকে আড়চোখে তাকিয়ে তিনি চাপা স্বরে বললেন, "কপ্টার থেকে রাই যা দেখেছিল, তা সত্যি হলেও আসলে সেটা সত্যি নয়, রাই সেটা নিজেও জানে। তাই ও নিজেও নিস্পৃহ আর আমিও। আজকের ওই ছাপ বা লোমের ব্যাপারটাও সাজানো। আসলে..." কী একটা বলতে গিয়েও যেন থেমে গেলেন তিনি। আর কোনও কথা না বলে হেরম্যানের হাত ছাড়িয়ে দ্রুত হাঁটতে শুরু করলেন।

সুদীপ্তরাও ফেরার পথ ধরল। চলতে-চলতে হেরম্যান বললেন, "বীরবাহাদুর পুরো ব্যাপারটা খোলসা করলেন না। ব্যাপারটা যদি সাজানো হয়, তবে কে কেন সাজালেন? রাই, বীরবাহাদুর নাকি..."

তবে বীরবাহাদুরের কথাটা শোনার পর হেরম্যান যে স্পষ্ট বিষণ্ণ হয়ে পড়েছেন, তা তাঁর মুখ দেখেই বুঝতে পারল সুদীপ্ত। কত দূর দেশ থেকে তিনি প্রাণীটার খোঁজে ছুটে এসেছেন, আর শেষ পর্যন্ত যদি সেটাই মিথ্যে হয়ে যায় তবে বিমর্ষ তো হওয়ারই কথা! সূর্য ডুবতে চলেছে। পাহাড়ের আড়াল থেকে বিকেলের আলো ছড়িয়ে পড়েছে বরফস্নাত প্রান্তরে। অপূর্ব সুন্দর পরিবেশ চারপাশে। হেরম্যান শুধু একবার বললেন, "ওঁরা যাই বলুন, ফিরে গিয়ে লামাকে যদি পাওয়া যায়, তবে তাঁকে একবার সোজাসুজি জিজ্ঞেস করব বরফের রাজার ব্যাপারে।"

আর কোনও কথা না বলে মঠের উদ্দেশে হাঁটতে লাগল দু'জন।

॥ ৯ ॥

মঠ চত্বরে পা রেখেই সুদীপ্তরা দেখতে পেল লামা ডং রিম্পুচিকে। এমন ভাবে তিনি মঠের সদর দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন যে, সুদীপ্তদের তাঁকে দেখে মনে হল, তিনি যেন তাঁদের প্রতীক্ষাতেই আছেন।

দৃষ্টিহীন মানুষদের অন্য ইন্দ্রিয়গুলো নাকি প্রখর হয়। সুদীপ্তরা তাঁর কাছাকাছি পৌঁছতেই তুষারে তাঁদের অস্পষ্ট পায়ের শব্দ সম্ভবত টের পেলেন তিনি। তাঁদের উদ্দেশে লামা বললেন, "সারাটা দিন কোথায় কাটালেন?"

সুদীপ্ত প্রথমে জবাব দিল, "আমরা তো আপনাকে খুঁজতে এসেছিলাম। অনেক ডাকাডাকির পরও দরজা বন্ধ রইল। তারপর..." তারপর সারা দিনের সব ঘটনা সুদীপ্ত মোটামুটি ভাবে জানিয়ে দিল তাঁকে।

লামা মনোযোগ দিয়ে সুদীপ্তর কথা শুনলেন, তারপর বললেন, "ভিতরে আসুন।"

তাঁর পিছন-পিছন মঠের ভিতর পা রাখল সুদীপ্তরা। লামা তাদের নিয়ে উপস্থিত হলেন প্রার্থনাকক্ষে। একটা প্রদীপ জ্বলছে বুদ্ধমূর্তির সামনে। তার আলোয় বেদির সামনের কিছুটা অংশ আলোকিত। বাকি ঘরটা গাঢ় অন্ধকারে ঢাকা।

লামা গিয়ে দাঁড়ালেন বেদির নীচে রাখা সেই লম্বা কাঠের বাক্সর সামনে। বাক্সের উপর রাজার মাথাটা রাখা। প্রদীপের আলোর একটা রেখা এসে পড়েছে মাথাটার মুখে। আলো-আঁধারিতে বীভৎস দেখতে লাগছে সেই মাথা। অজানা কোনও পথিক যদি মঠের এ ঘরে ঢুকে এই মুহূর্তে হঠাৎ মাথাটা দ্যাখে, তবে নির্ঘাত সে ভিরমি খাবে!

কাঠের বাক্সের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁর শীর্ণ হাত দু'টো বুকের উপর রেখে লামা সুদীপ্তদের মুখোমুখি দাঁড়ালেন। প্রদীপের আলোয় তাঁর সাত ফুট লম্বা দীর্ঘ অবয়বটা কেমন যেন ভৌতিক মনে হচ্ছে!

হেরম্যান, সুদীপ্তর দিকে একবার তাকিয়ে নিয়ে একটু ইতস্তত করে লামার উদ্দেশ বললেন, "আপনার কাছে আমার একটা ব্যাপারে জানার ছিল।"

"এই রাজার মাথা বা যে পায়ের ছাপ আজ আপনারা দেখেছেন, বা যার গল্প শুনেছেন তার ব্যাপারে কি?" সুদীপ্তদের অবাক করে দিয়ে পালটা প্রশ্ন করলেন লামা ডং রিম্পুচি।

বিস্মিত হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, কিন্তু ব্যাপারটা জানলেন কীভাবে? থট রিডিং?"

লামার ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল। তিনি বললেন, "না, থট রিডিং নয়, অনুমান। প্রথমত, নীচের মঠে আপনারা দু'জন মাথাটা দেখার পর এ বিষয় যে আলোচনা করছিলেন, সে খবরটা মাথাটা যাঁরা এখানে পৌঁছে দিতে এসেছিলেন, তাঁরা আমাকে বলেছিলেন, আপনাদের চেহারার বিবরণও তাঁরা দিয়েছিলেন। কাজেই আপনাদের দেখার পর প্রাথমিক ভাবে আপনাদের উপর আমার একটা সন্দেহ হয়েছিল, কিন্তু আপনারা ভদ্রলোক, অত দূর থেকে আসছেন বলে আমি আপনাদের ফেরাইনি। দ্বিতীয়ত, আপনারা আমাকে বলেছিলেন, বৌদ্ধ ধর্মদর্শন ও জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আপনারা জানতে এসেছেন এখানে। কিন্তু এ ব্যাপার আপনারা আমাকে কোনও প্রশ্ন করেননি বা আগ্রহ প্রকাশ করেননি। কত মঠ তো ছড়িয়ে আছে সারা পৃথিবীতে। হঠাৎ আপনারা কেন এলেন এই দুর্গম মঠে? এ মঠে তো তেমন কিছু দেখার নেই, কোনও সম্পদও সে অর্থে নেই। তবে কীসের টানে আপনারা ছুটে এলেন এখানে? হ্যাঁ, একটা ব্যাপার এ মঠকে কেন্দ্র করে ইদানীং প্রচারিত হচ্ছে, তুষার দেশের রাজার গল্প! যাকে কেউ

বলে মিগু, কেউ বা বলে ইয়েতি, আবার কেউ বা ডাকে বড়-পা বলে। তাকে নাকি দেখা যায় এখানে! তবে কি তারই খোঁজে এসেছেন আপনারা? বৌদ্ধশাস্ত্র সম্বন্ধে জ্ঞানার্জনের জন্য বা মঠের জীবনযাত্রা জানার জন্য তো রাত জেগে বসে থাকতে হয় না? পায়ের ছাপ খুঁজে বেড়াতে হয় না এই বরফের রাজ্যে? কাজেই...” একটানা কথাগুলো বলে থামলেন লামা।

সুদীপ্তরা অবাক হয়ে গেল লামার কথা শুনে। বুঝতে পারলেন তারা ধরা পড়ে গিয়েছেন। হেরম্যান এবার বললেন, “হ্যাঁ, আমরা তার খোঁজেই এসেছি। আসলে আমি একজন ক্রিপ্টোজুলজিস্ট। ক্রিপ্টিড অর্থাৎ গল্পকথার প্রাণীদের খুঁজে বেড়াই। অর্থের জন্য নয়, রহস্যের টানে। পাছে আপনি মঠে আশ্রয় না দেন, সে ভয়ে এটুকু মিথ্যা বলতে হয়েছে। এ জন্য ক্ষমা করবেন। তবে নাম, ঠিকানা আমরা মিথ্যে বলিনি। কোনও খারাপ অভিপ্রায় নিয়ে আমরা এখানে আসিনি। সত্য অন্বেষণে এসেছি।”

হেরম্যানের কথা শুনে অপলক দৃষ্টিতে লামা কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন তাঁর দিকে। তারপর মৃদু হেসে বললেন, “আপনারা যাকে খুঁজছেন, সে কোথায় আছে জানেন? এই বাক্সের মধ্যে। চিতাগুলোর মতো তুষারদেশের রাজাকেও পোষ মানিয়েছি আমি।”

বাক্সের মধ্যে! অবাক হয়ে গেল সুদীপ্তরা। বাক্সটা তো প্রায় দশ ফুট লম্বা। তা হলে সত্যিই ওর মধ্যে আছে?

“আসুন তা হলে তাকে দেখাই। ও অনেকক্ষণ ধরে বাক্সে আটকে আছে, ওর কষ্ট হচ্ছে।”

সুদীপ্তরা বাক্সের কাছে এগিয়ে গেল। লামা বাক্সের উপর থেকে মাথাটা তুলে প্রথমে সুদীপ্তর হাতে দিলেন। সেটা ধরে শরীরটা কেমন যেন শিরশির করে উঠল সুদীপ্তর। লামা ডং এর পর বাক্সের ডালাটা ধীরে-ধীরে ওঠালেন। সুদীপ্তর বুকের ভিতর যেন কেউ হাতুড়ি পিটছে, হেরম্যানের চোখে-মুখেও তীব্র উত্তেজনার ছাপ। শুধু লামার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি।

বাক্সের বিরাট ডালাটা প্রদীপের আলোটাকে আড়াল করে রেখেছে। বাক্সের ভিতর জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুদীপ্ত ঝুঁকে পড়ে বাক্সের ভিতর দেখতে গিয়েও থেমে গেল। প্রাণীটা লামার পোষা, কিন্তু সুদীপ্তদের তো নয়। বলা যায় না। সে বাক্সের ভিতর থেকে লম্বা হাত বের করে সুদীপ্তর গলা চেপে ধরতে পারে!

তাদের চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে লামা তাঁর লম্বা হাত বাড়িয়ে প্রদীপটা তুলে নিয়ে বাক্সের সামনে ধরলেন। কিন্তু এ কী? বাক্সের মধ্যে তো কিছু নেই! সুদীপ্তরা অবাক হয়ে তাকালেন লামার মুখের দিকে। লামা ডং রিম্পুচি এর পর বাক্সের মধ্যে ঝুঁকে পড়ে একে-একে বের করে আনলেন লোমের তৈরি বিরাট এক জোব্বার মতো পোশাক, বিরাট দস্তানা, বড় পায়ের জুতো। বিস্মিত সুদীপ্তরা তাকিয়ে আছেন তাঁর দিকে। লামা সেই পোশাক, দস্তানা, জুতোগুলো পরে ফেললেন। তারপর সুদীপ্তর হাত থেকে তুষারদেশের রাজার মাথাটা নিয়ে হেলমেটের মতো পরে ফেললেন নিজের মাথায়। মাথা আর বিরাট সোলওয়ালা জুতোর জন্য তাঁর উচ্চতা আরও বেড়ে গেল। সুদীপ্তদের সামনে এখন দাঁড়িয়ে আছেন প্রায় আট ফুট লম্বা তুষারদেশের রাজা! কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপর আবার সেগুলো ধীরে-ধীরে খুলে সেগুলো বুদ্ধমূর্তির সামনে বেদির উপর রাখলেন লামা।

সুদীপ্ত বা হেরম্যান তাঁকে কী বলবে, ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না। লামা মুখ খুললেন, তিনি বললেন, “এ সবই পাহাড়ি ভল্লুকের চামড়া দিয়ে তৈরি। এ পোশাকেই রাই আমাকে দূর থেকে দেখেছিল মঠ চত্বরে। তখন সঙ্গে ওই চিতাটাও ছিল। তবে কপ্টার থেকে নয়। একটা পাথুরে তাকে সে দাঁড়িয়ে ছিল, আর কপ্টারটা নামানো ছিল কিছু দূরে। এখানে কপ্টার নামানোর ব্যাপারটা লোককে বললে সে বিপদে পড়ত। সে কারণেই আকাশ থেকে অদ্ভুত প্রাণী দেখার গল্পটা বানিয়েছে সে। যদিও বেশ কয়েকবার এখানে কপ্টার নামিয়েছে সে।”

“কেন?” জানতে চাইলেন হেরম্যান।

বৃদ্ধ লামা জবাব দিলেন, “তুষারচিতা শিকার করার জন্য। ওর চামড়ার তো অনেক দাম। গোটাতিনেক প্রাণী মেরেছে ও। মাউন্টেনিয়ারদের পৌঁছে দিয়ে বা অন্য কাজে পিকে গিয়ে ফেরার পথে ওই কাজটা করে। কেউ ধরতেও পারত না ব্যাপারটা। যে চিতাটা মানুষের উপর খেপে গিয়েছে, তাকেও গুলিটা ও-ই করেছিল। একটা পায়ে চোট লেগেছে প্রাণীটার। ও আসলে পোচার। ছদ্মবেশী চোরাশিকারি,” একথা বলে বৃদ্ধ লামা তাকালেন সুদীপ্তর দিকে।

প্রদীপের স্বল্প আলোতেও হঠাৎ সুদীপ্তর কেন জানি মনে হল, লামার চোখের মণি দু'টো যেন আর স্থির নয়, সে দু'টো একবার তার, অন্যবার হেরম্যানের মুখের উপর ঘুরছে!

সুদীপ্ত এবার একটু ইতস্তত করে প্রশ্নটা করেই ফেলল, “আপনি কি দেখতে পান? নইলে কীভাবে আপনি বুঝলেন যে, রাতে জানলা থেকে আমরা আপনাকে দেখেছি?”

লামা রিম্পুচি বললেন, “হ্যাঁ পাই, তবে যোগাভ্যাসের মাধ্যমে আমি দীর্ঘক্ষণ চোখের মণি স্থির রাখতে পারি, এমনকী, নিশ্বাস বন্ধ করেও থাকতে পারি।”

“কিন্তু দৃষ্টিহীন সাজার বা তুষারদেশের রাজা সাজার কী প্রয়োজন?”

“আমি এ সবই সেজেছি প্রকৃতির সন্তান, অদ্ভুত সুন্দর প্রাণী ওই তুষারচিতাগুলোকে বাঁচানোর জন্য। বড় পায়ের ছাপ দেখে স্থানীয় কুসংস্কারগ্রস্থ শিকারিরা যাতে এ তল্লাটে না আসে, সেজন্য। আর দৃষ্টিহীন সেজে থাকলে আমার সামনে কেউ কিছু গোপন করে না। ভাবে, আমি দেখতে পাচ্ছি না কিছু। একবার আমার সামনেই এক শিকারি একটা প্রাণীকে মারার জন্য বন্দুক তুলেছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য মারতে পারেনি। সাংকেতিক আওয়াজে আমি সতর্ক করে দিই প্রাণীটাকে। তবে রাইয়ের মতো শিক্ষিত শিকারিকে আমি শেষ পর্যন্ত মনে হয় ধোঁকা দিতে পারিনি। সে বুঝতে পেরেছিল, ব্যাপারটায় কোনও গন্ডগোল আছে। তুষারদেশের রাজা বা ইয়েতির ব্যাপারটা আসলে সাজানো। রাই সেই ভেবেই মনে হয় গল্পটা প্রচার করেছিল, যাতে লোকজন ব্যাপারটা নিয়ে অনুসন্ধান করতে আসে এবং ব্যাপারটা ধরে ফেলে আমাকে অপদস্থ করে, যাতে আমি মঠ ছেড়ে চলে যাই, তার কাজের সুবিধে হয়। বিমান কোম্পানির লোকেরাও খুঁজতে এসেছিল, কিছু পায়নি। উলটে আমি তাদের কাছে রাইয়ের আসল পরিচয় জানিয়ে দিই,” একটানা কথাগুলো বলে থামলেন লামা রিম্পুচি।

সুদীপ্ত বলল, “আর সে জন্যই মনে হয় ওর চাকরিটা যায়। কিন্তু আপনার কথাই বা বিমান কোম্পানির লোকেরা বিশ্বাস করল কেন?”

লামা বললেন, “কিছু দূরে একটা পাহাড়ি তাকের গায়ে একটা গুহা আছে। তার মুখে ইস্পাতের গরাদ বসিয়ে একটা ঘরের মতো বানিয়েছিল শিকারিরা। বানিয়েছিল অবশ্য আমার চোখের সামনেই, আমাকে দৃষ্টিহীন ভেবে। এ ব্যাপারটা অবশ্য রাইও ঠিক ধরতে পারেনি। ঘরটায় শিকার করা পশুর দেহ-চামড়া, বন্দুক ইত্যাদি রাখা হয়। যারা ইয়েতির ব্যাপারটা অনুসন্ধান করতে এসেছিল, আমি তাদের সেখানে নিয়ে যাই। সেখানে বিমান কোম্পানির এমব্লেম আঁকা রাইয়ের জ্যাকেটসহ তার কিছু ব্যক্তিগত জিনিসপত্র মেলে। তার মধ্যে একটা রাইফেলও ছিল।”

নিস্তব্ধ ঘর। লামা এর পর বললেন, “আজ রাতেই এ মঠ ছেড়ে আমি চলে যাব। চিতাগুলো রয়ে গেল, রাইয়ের মতো লোকেরাও রইল। জানি না, এর পর কী হবে?”

সুদীপ্ত বলল, “আচ্ছা, রেঞ্জার বীরবাহাদুর বলে লোকটাকে আপনি চেনেন? সেও কি এসব কাজ করে?”

লামা রিম্পুচি যেন মৃদু চমকে উঠলেন বীরবাহাদুরের নাম শুনে। বললেন, “না, না, সে ভাল লোক।”

প্রদীপের আলোটা দপদপ করতে শুরু করেছে। মনে হয় সেটা নেভার সময় হয়ে এসেছে। লামার ঠোঁটে বিষণ্ণ হাসি। তিনি বললেন, “চলে যাওয়ার আগে এই বুদ্ধমূর্তির সামনে শেষবারের জন্য

উপাসনায় বসব আমি, সামান্য কিছু জিনিসও গুছিয়ে নিতে হবে। এবার তা হলে আপনারা আসুন। আজ রাতটা মঠেই বিশ্রাম নিন। কাল তো নিশ্চয়ই আপনারাও মঠ ছেড়ে রওনা হবেন। ভগবান বুদ্ধর আশীর্বাদে আপনারা, এই পাহাড়, উপত্যকা, ওই চিতাগুলো সবাই ভাল থাকুক।"

হেরম্যান দীর্ঘক্ষণ চুপ করে ছিলেন। সাত সমুদ্র পেরিয়ে তুষারদেশের রাজা, ইয়েতির খোঁজে আসা হেরম্যানের আশাভঙ্গের বেদনা কিছুটা হলেও অনুভব করতে পারছে সুদীপ্ত। তিনি এবার লামাকে বললেন, "যাওয়ার আগে আপনার কাছে আমার একটা শেষ প্রশ্ন আছে। তবে কি ইয়েতি বা তুষার দেশের রাজাকে নিয়ে যুগ-যুগ ধরে চলে আসা সব গল্পই মিথ্যে? কিছু লোকের আত্মপ্রচার বা ব্যক্তিগত স্বার্থসিদ্ধির কোনও কৌশল? কোনও দিনই কি কোনও ধরনের প্রাণী ছিল না এই বিশাল, বিপুল, অচেনা, অজানা হিমালয়ের কোলে?"

লামা যেন কিছুক্ষণের জন্য থমকে গেলেন, তারপর ধীরে-ধীরে বললেন, "হয়তো তারা একদিন ছিল। প্রাচীন কিছু বৌদ্ধ পুঁথিতে তাদের উল্লেখ আছে। প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা তাদের উপাসনা করতেন। এত বড় প্রাণীকে বশ করে রাখার জন্য বছরের পর-বছর তাদের ঘুম পাড়িয়ে রাখার কৌশলও জানতেন তাঁরা। প্রয়োজনে আবার তাদের জাগিয়ে তুলতে পারতেন, এসব কথাও লেখা আছে পুঁথিতে," এর পর একটু থেমে তিনি বললেন, "আমি যখন গৃহী ছিলাম, তখন একটা বইয়ে পড়েছিলাম, আদিম দানবাকৃতি বাঁদর জায়গান্টোপিথিকাসের একটা শাখা নাকি এই হিমালয়েও বসবাস করত। হয়তো তাদের কথাই বলা আছে প্রাচীন বৌদ্ধ পুঁথিতে।"

লামার এ কথা শুনে সুদীপ্তরা বুঝতে পারল, শুধু বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন নয়, তার বাইরেও অন্য ধরনের জ্ঞানভাণ্ডার আছে এই লামার। নইলে জায়গান্টোপিথিকাসের কথা বলতেন না তিনি।

হেরম্যান বলে উঠলেন, "আপনার কি মনে হয়, ওরকম প্রাণীর অস্তিত্ব এখনও এই তুষারদেশে থাকতে পারে?"

বৃদ্ধ আবার কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, "হয়তো আমার মতের সঙ্গে আপনার মত মিলবে না, তবুও বলি, তাদের কেউ যদি এই তুষাররাজ্যে টিকেও থাকে তবে তাকে খুঁজতে যাবেন না, তাকে তুষারদেশের রাজা হয়েই থাকতে দিন। মানুষের লোভ বড় সাঙ্ঘাতিক জিনিস। তুষারচিতাগুলোর অবস্থা দেখছেন না!"

এ কথা বলে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে বললেন, "আপনারা কি সত্যিই সন্দেহ করেছিলেন যে তুষারদেশের রাজা এই বাক্সের মধ্যেই আছে? প্রথমদিন তো বারবার এই বাক্সটার দিকে দেখছিলেন," এই বলে তিনি সুদীপ্তর দিকে তাকালেন।

হেরম্যান এর পর আরও কী একটা প্রশ্ন করতে গেলেন, কিন্তু তিনি হাত তুলে হেরম্যানকে থামিয়ে দিয়ে বুঝিয়ে দিলেন, অনেক কথা হয়েছে, আর কোনও কথা নয়, এবার কক্ষ ত্যাগের সময় হয়ে গিয়েছে।

সুদীপ্তরা লামাকে নমস্কার জানিয়ে প্রার্থনাকক্ষের বাইরে বেরোতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে বাইরে কার যেন চিৎকার চেঁচামেচি, হাঁকডাকের শব্দ শোনা গেল। বুদ্ধমূর্তির সামনে উপাসনায় বসতে গিয়েও শব্দটা শুনে লামা সঙ্গে-সঙ্গে দাঁড়িয়ে পড়লেন। সুদীপ্ত লক্ষ করল, লামার চোখের মণি দু'টো সঙ্গে-সঙ্গে অদ্ভুত ভাবে স্থির হয়ে গেল।

সদর দরজার সামনে বেরিয়ে এল সুদীপ্তরা। তাঁদের পিছন-পিছন লামাও এলেন। বাইরে এসেই তারা দেখতে পেল রাইয়ের সেই দু'জন উপজাতি শিকারির মধ্যে একজনকে। লোকটা হাউমাউ করে চিৎকার করে যা বলল, তার মর্মার্থ হল, কিছুক্ষণ আগে রাইয়ের নেতৃত্বে তারা দু'জন চিতাটার সন্ধানে বেরিয়েছিল। হঠাৎই পাহাড়ের গায়ে একটা সংকীর্ণ বাঁকের মুখে তাঁদের সঙ্গে মুখোমুখি দেখা হয়ে যায় প্রাণীটার। কারওরই তখন পিছোনোর আর উপায় নেই। কারণ, পথের একপাশে পাথরের মসৃণ দেওয়াল, আর অন্যপাশে গভীর খাদ। রাই প্রথমে ছিলেন, সংকীর্ণ পথে তিনি কাঁধ থেকে বন্দুক খোলার আগেই প্রাণীটা ঝাঁপিয়ে পড়ে রাইয়ের উপর। তারপর রাইকে ক্ষতবিক্ষত করে, নিজে খাদে পড়ে যায়। রাই নীচে না পড়লেও তাঁর ঘাড় ভেঙে দিয়েছে প্রাণীটা। লোক দু'জন তাঁকে কোনওরকমে ধরাধরি করে কাছেই একটা গুহায় নিয়ে রেখেছে। রাই সম্ভবত বাঁচবেন না। একজনকে তাঁর কাছে রেখে এ লোকটা মঠে তাঁদের ডাকতে এসেছে, যদি শেষ মুহূর্তে তাঁকে কোনও ভাবে বাঁচানো যায় সে জন্য।

তার কথা শুনে লামা মন্তব্য করলেন, "এরকমই কোনও দুর্ঘটনা ঘটবে বলে আমার আশঙ্কা ছিল। প্রাণীটা ওকে ভাল ভাবে চিনে ফেলেছিল। এ জায়গা ছেড়ে ওকে চলে যেতে বলেছিলাম, গেল না। প্রাণীটা মরার আগে প্রতিশোধ নিল, ও লোকটা যতই খারাপ হোক, ব্যাপারটা দুর্ভাগ্যজনক।"

সুদীপ্ত বলল, "তা হলে এখন আমাদের কী করা উচিত?"

লামা ডং রিম্পুচি আকাশের দিকে তাকিয়ে বললেন, "সূর্য অস্ত যেতে বসেছে, আমার প্রার্থনার সময় পেরিয়ে যাচ্ছে। লোকটা যখন মৃত্যুপথযাত্রী, তখন সে ভাল-মন্দ যে লোকই হোক, তার কাছে কারও একবার যাওয়া উচিত। হয়তো শেষ মুহূর্তে আপনাদের কাছে অপরাধ কবুল করলে ওর আত্মার মুক্তি ঘটবে। যান ঘুরে আসুন, সাবধানে যাবেন।" এই বলে লামা পিছন ফিরে এগোলেন প্রার্থনাকক্ষের দিকে।

হেরম্যান সুদীপ্তকে বললেন, "চলুন, তা হলে ওখান থেকে একবার ঘুরেই আসি। আমাদের তো আর কোনও কাজ নেই, কাল ভোরেই ঘরে ফেরার পালা," বিষণ্ণতার সুর স্পষ্ট হেরম্যানের গলায়।

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, যাব। একটু দাঁড়ান। যাওয়ার আগে ঘর থেকে আমাদের মেডিক্যাল কিটটা নিয়ে নিই, যদি তা দিয়ে লোকটাকে কোনও ভাবে সাহায্য করা যায়।"

সুদীপ্ত উপরে উঠে মেডিক্যাল কিট নিয়ে যখন নীচে নামল, তখন প্রার্থনাকক্ষের দরজা বন্ধ হয়ে গিয়েছে। ঘরের ভিতর থেকে ভেসে আসছে লামা ডং রিম্পুচির মন্ত্রোচ্চারণ আর জপযন্ত্র ঘোরানোর ঘরঘর শব্দ। প্রার্থনায় বসে গিয়েছেন তিনি। সুদীপ্তরা যখন সেই লোকটার সঙ্গে মঠ ছেড়ে রওনা হলেন, তখন দিনের শেষ আলো পাহাড়ের আড়াল থেকে উঁকি দিচ্ছে।

॥ ১০ ॥

গুহাটা যেখানে, সে জায়গা মঠ থেকে বেশি দূর নয়, আলো থাকতেই লোকটার সঙ্গে তাঁরা সে জায়গায় পৌঁছে গেলেন। গুহাটা একটা সংকীর্ণ তাকের শেষ প্রান্তে। তার একপাশে মসৃণ পাথুরে দেওয়াল, অন্য পাশে গভীর খাদ। ইগুলুর প্রবেশমুখের মতো গুহার মুখটা পাহাড়ের গা থেকে বেশ কিছুটা বাইরে বেরিয়ে এসেছে। গুহার সামনে, তার ছাদে স্তূপাকৃত তুষার জমা হয়ে আছে। সেই তুষারের ভিতর থেকে অন্ধকার গুহামুখটা শুধু উঁকি দিচ্ছে। তার সামনে কোলে বন্দুক শুইয়ে একটা পাথরের চাঁইয়ের উপর হতাশ ভাবে বসে ছিল শিকারিদের অন্যজন। সুদীপ্তরা কাছে গিয়ে দাঁড়াতেই সে উঠে দাঁড়িয়ে বিষণ্ণ ভাবে বলল, "সাহেব মনে হয় আর বাঁচবেন না। শুধু আপনাদের কথা বলছেন। ও কষ্ট আমার আর সহ্য হচ্ছে না। তাই বাইরে বেরিয়ে এলাম," এই বলে ছোট বাচ্চার মতো ডুকরে কেঁদে উঠল সেই শিকারি।

"কই দেখি?" বলে হেরম্যান সুদীপ্তকে নিয়ে গুহার ভিতর পা রাখলেন। কিন্তু দেখবেন কী? বিরাট ঘরের মতো গুহাটার শেষ প্রান্ত পর্যন্ত বাইরের আলো প্রবেশ করতে পারছে না। সেখানে খেলা করছে জমাট বাঁধা অন্ধকার। সুদীপ্ত বলল, "কই, তাঁকে দেখতে পাচ্ছি না তো?"

পিছন থেকে গুহার প্রবেশপথে দাঁড়িয়ে থাকা শিকারি বলল, "দেওয়ালের গায়ে হেলান দিয়ে ওঁকে বসিয়ে রাখা হয়েছে। এগোন, দেখতে পাবেন।"

আরও কয়েক পা এগিয়ে গেল তারা। কিন্তু পাথুরে দেওয়ালের

শেষ প্রান্তে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। হঠাৎ সুদীপ্তর খেয়াল হল, তার পকেটে একটা ছোট টর্চ আছে। সেটা বের করে দেওয়ালের গায়ে আলো ফেলল সুদীপ্ত। কিন্তু কোথাও তো কেউ নেই। গুহার শূন্য পাথুরে দেওয়ালে পিছলে যাচ্ছে টর্চের আলো। সুদীপ্তরা পিছন ফিরে দরজার কাছে দাঁড়ানো লোক দু'জনকে ব্যাপারটা কী হল জিজ্ঞেস করতে যাচ্ছিলেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘড়াং করে প্রচণ্ড জোরে একটা শব্দ হল। চমকে উঠে পিছন ফিরে সুদীপ্ত দেখতে পেল, বাইরে মাথার উপর থেকে গুহার মুখে নেমে এসেছে লোহার গরাদওয়ালা একটা খাঁচা! গুহার ভিতর আটকা পড়ে গিয়েছেন সুদীপ্তরা, আর সে দু'জন লোক গুহার বাইরে দাঁড়িয়ে দাঁত বের করে হাসছে।

"ব্যাপারটা কী হল?" হেরম্যান জিজ্ঞেস করলেন তাদের। তারা কোনও জবাব না দিয়ে হাসতে থাকল। আর এর পরই গুহার মাথার উপর থেকে লাফ দিয়ে গরাদের ওপাশে গুহার মুখে নামলেন মিস্টার রাই। তিনি সুদীপ্তদের বললেন, "আমাকেই তো খুঁজছিলেন আপনারা? না আমাকে এখনও বাঘে খায়নি। এই তো আমি!"

হেরম্যান বলে উঠলেন, "এ সবের মানে কী?"

রাই বললেন, "মানে হল, আজ রাতে আপনারা আমার অতিথি। অবশ্য বুড়োটাকেও সঙ্গে আনতে পারলে ভাল হত। আমরা তো তিনজন, তা হলে আপনাদের তিনজনকে নিয়ে তিন জায়গায় পারতাম।"

হেরম্যান উত্তেজিত ভাবে বললেন, "আপনার কথা আমি কিছুই বুঝতে পারছি না। হেঁয়ালি ছাড়ুন। গুহামুখে দরজাটা পড়ে গেল কীভাবে? দরজাটা খুলুন।"

রাই হেসে বললেন, "উত্তেজিত হবেন না। ব্যাপারটা আমি আপনাকে বুঝিয়ে বলছি। তুষারচিতাটাকে মারতে হবে তো! তাই আপনাদের আনালাম।"

"আমরা তো শিকারি নই, আমাদের আনালেন কেন?" তাঁর কথার মাঝে বলে উঠল সুদীপ্ত।

রাই বললেন, "ব্যস্ত হবেন না। সে কথাই তো বলছি। চিতাটা তো আর এমনি আসবে না। প্রাণীটার জন্য টোপ ফেলতে হবে। আর সে টোপ হবেন আপনারা।"

"শয়তান!" চিৎকার করে উঠলেন হেরম্যান।

রাই কিন্তু উত্তেজিত হলেন না। তিনি বললেন, "আপনাদের দু'জনের খুব কষ্ট হবে না। একটা রাত শুধু হাত-পা বাঁধা অবস্থায় বরফের উপর বসে রাত কাটাতে হবে। ঘাবড়াবেন না। আমার বা আমার সঙ্গীদের হাতের রাইফেলের নিশানা খুব ভাল। দুশ্চিন্তা করবেন না, তুষারচিতাটা আপনাদের ঘাড়ে ঝাঁপানোর আগেই এক গুলিতে তার ঘাড় ভেঙে দেব।"

সুদীপ্ত বলল, "আপনি এসব কী পাগলামি করছেন? দরজাটা ওঠান, আমাদের বাইরে বেরতে দিন। আমরা দু'জনেই বিদেশি নাগরিক। আমরা যে এখানে এসেছি, তা সরকারি খাতায় নথিবদ্ধ আছে। আমাদের কিছু হলে সরকার আপনাকে..."

সুদীপ্তর কথা শেষ হওয়ার আগেই রাই বলে উঠলেন, "সরকারি খাতায় আপনাদের নাম আছে তো কী হয়েছে, কত লোকেরই তো সরকারি খাতায় নাম থাকে, কিন্তু হিমালয় এসে তারা ফেরে না। তুষারা চাপা পড়ে বা পা পিছলে খাদের নীচে হারিয়ে যায়। আপনাদের বেলায়ও তেমন হলে সরকারি নথিতে সেরকম কিছুই লেখা থাকবে," এই বলে গরাদ ধরে দাঁড়িয়ে মূর্তিমান শয়তানের মতো হাসতে লাগলেন। অন্য দু'জনও তাঁর সঙ্গে হাসিতে যোগ দিল।

হেরম্যান বললেন, "আপনি চিতাবাঘের হাতে মৃতপ্রায় বলে আপনার জন্য আমরা ছুটে এলাম এখানে আর আপনিই আমাদের বাঘের মুখে ফেলে দিচ্ছেন!"

রাই অট্টাহাস্য করে বলে উঠলেন, "একজনকে বাঁচাতে হলে অনেক সময় অন্য একজনকে মরতে হয়। প্রকৃতির এই নিয়মটা নিশ্চয়ই আপনারা জানেন। তাই আমাকে বাঁচাবার জন্য আপনারা..."

ঠিক এই সময় সুদীপ্ত একটা কাণ্ড করে বসল। রাইকে আর কোনও ভাবে বোঝানো যাবে না বুঝতে পেরে গরাদের কাছে ছুটে এসে রাইয়ের একটা হাত গরাদের ভিতর টেনে ধরে চিৎকার করে বলে উঠল, "তা হলে এই হাতও গরাদের ভিতরই থাকবে।" রাইয়ের হাতটা নিয়ে গরাদের এপাশে-ওপাশে একটা ধস্তাধস্তি শুরু হল। সুদীপ্তর টেনে ধরা হাতটা কিছুতেই বাইরে নিতে পারছেন না রাই। তিনি "হাত ছাড়-ছাড়!" বলে চেঁচাতে লাগলেন।

হেরম্যান সম্ভবত ঘটনার আকস্মিকতায় মুহূর্তের জন্য কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে গিয়েছিলেন। বাইরের অন্য দু'জন শিকারি কিন্তু ছুটে এসেছে। তাদেরই একজন হঠাৎ গরাদের ফাঁক দিয়ে রাইফেলের পিছন দিকটা ভিতরে গলিয়ে তার কুঁদো দিয়ে সজোরে আঘাত করল সুদীপ্তর মাথায়। সুদীপ্ত দু'হাতে টেনে রেখেছিল রাইয়ের হাত, তাই সে সরে গিয়ে আঘাত এড়াতে পারল না। মাথায় রাইফেলের কুঁদোর বাড়ি খেয়ে সে পড়ে গেল মাটিতে। আর রাইও গুহার বাইরে বরফের মধ্যে ছিটকে পড়লেন। পরক্ষণেই কিন্তু তিনি আবার স্প্রিংয়ের মতো লাফিয়ে উঠে দাঁড়িয়ে পাশের শিকারির হাত থেকে রাইফেল টেনে নিয়ে গরাদের ফাঁকে নল ঢুকিয়ে গুলি করতে উদ্যত হলেন মাটিতে পড়ে থাকা সংজ্ঞাহীন সুদীপ্তকে।

ততক্ষণে অবশ্য হেরম্যান এসে সুদীপ্তর দেহটাকে আড়াল করে দাঁড়িয়েছেন। গুলি চালালে গুলিটা তখন তাঁর গায়েই লাগবে। রাই হয়তো গুলি চালাতেনও, কিন্তু শিকারি দু'জন সে কাজ থেকে নিবৃত্ত করল তাঁকে। তারা বলল, "এখন গুলি চালালে তার শব্দে তুষারচিতাটা দূরে পালিয়ে যেতে পারে। তার চেয়ে কাজ মিটে গেলে এ দু'জন লোককে খাদে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে।"

রাই শেষ পর্যন্ত তাদের যুক্তি মেনে নিলেন। হেরম্যানের উদ্দেশে তিনি বললেন, "তাঁবু থেকে ফিরে এসে তোদের মজা দেখাচ্ছি। আর বুড়ো লামাটার মজাও এ তল্লাট ছেড়ে যাওয়ার আগে দেখিয়ে যাব। ওকেও চাঁদমারি বানাব। বদমাশটার ইয়েতি সাজা বের করছি। চিতাটাকে আগে নিকেশ করি, তারপর ওকে।"

শিকারিদের একজন গরাদের ভিতর পড়ে থাকা সুদীপ্তকে দেখিয়ে বলল, "ভালই হল, এ লোকটার মাথা ফেটেছে। ওর রক্তের গন্ধ চিতাটাকে টোপের কাছে টেনে আনবে। সামান্য রক্তের গন্ধও ওরা বহু দূর থেকে টের পায়।"

রাই এর পর আর কোনও কথা না বলে তাঁর সঙ্গী দু'জনকে নিয়ে রওনা হলেন তাঁদের তাঁবুর দিকে। ঠিক সেই সময় হঠাৎ বাইরে ঝুপ করে সন্ধে নামল। অন্ধকারে ঢেকে গেল গুহার ভিতর-বাইরে। তাঁরা দূরে চলে যাওয়ার পর হেরম্যান গুহার মেঝে হাতড়ে-হাতড়ে উদ্ধার করলেন সুদীপ্তর টর্চ আর মেডিকেল কিটটা। তারপর টর্চ জ্বালিয়ে এগিয়ে এলেন মাটিতে পড়ে থাকা সুদীপ্তর দিকে। তার আঘাত গুরুতর। রক্তে ভেসে যাচ্ছে গুহার মাটি। তাড়াতাড়ি মেডিক্যাল কিটটা খুললেন হেরম্যান।

সুদীপ্তর যখন জ্ঞান ফিরল, তখন বাইরে চাঁদ উঠেছে। তার আলোয় গরাদের ফাঁক দিয়ে দেখা যাচ্ছে দূরের তুষারশৃঙ্গ, গুহার সামনে তুষারবিছানো পথ। চাঁদের আলোয় রুপোলি দেখাচ্ছে সব কিছু। সব যেন গলিত রুপো দিয়ে তৈরি। গরাদের ফাঁক গলে একফালি চাঁদের আলো এসে পড়েছে সুদীপ্তর পায়ের সামনে। গুহার অন্ধকার তাতে কিছুটা কেটেছে। সুদীপ্ত উঠে বসে প্রথমে বেশ কিছুক্ষণ চেয়ে রইল গরাদের বাইরের অপরূপ পৃথিবীর দিকে। সে এভাবে বসে আছে কেন? প্রথমে তার কিছুই মনে পড়ছিল না। কিছুক্ষণের মধ্যেই সে সংবিৎ ফিরে পেয়ে উঠে দাঁড়াতে যেতেই পাশ থেকে হেরম্যান তার কাঁধে হাত রেখে বললেন, "থাক, ওঠার দরকার নেই। এখন বসে থাকো।"

সুদীপ্ত প্রশ্ন করল, "ওরা কি আর এসেছিল?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "না, আসেনি। তবে সম্ভবত এখনই আসবে। অনেকক্ষণ তো হয়ে গেল। রাত প্রায় আটটা বাজে।"

আটটা বাজে! তার মানে দু' ঘণ্টারও বেশি সময় অজ্ঞান হয়ে ছিল সুদীপ্ত। মাথায় হাত দিল সে। অজ্ঞান অবস্থায়ই তার মাথায় মেডিক্যাল

কিট থেকে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিয়েছেন হেরম্যান। তবে রক্তপাতের জন্য বেশ দুর্বল লাগছে সুদীপ্তর শরীর। সুদীপ্ত বলল, "এটাই মনে হয় সেই গুহা, যার কথা লামা বলেছিলেন। যেখানে চোরাশিকারিরা তাদের জিনিসপত্র রাখে।"

হেরম্যান বললেন, "হ্যাঁ, সে জায়গাই হবে। জিনিসপত্র লুকিয়ে রাখার পক্ষে আদর্শ জায়গা।"

সুদীপ্ত এর পর বলল, "গরাদটা কোনওভাবে ভাঙা বা খোলা যাবে না?"

হেরম্যান বললেন, "না, যাবে না। ইতিমধ্যে আমি কয়েকবার ও চেষ্টা করেছি। পুরনো হলেও ইস্পাতের ভারী গরাদ। ভাঙা যাবে না, আর উপর থেকে এটা টেনে না তুললে খোলাও যাবে না। আমরা যখন এখানে ঢুকি, তখন ওটা গুহার ছাদে তুষার চাপা দেওয়া অবস্থায় ছিল, আমরা তাই খেয়াল করতে পারিনি।"

"তা হলে এখন কী উপায়?"

"ভাগ্যের উপর নির্ভর করে অপেক্ষা করা ছাড়া অন্য কোনও উপায় তো এখন দেখছি না। তবে ওরা ফিরলে শেষ মুহূর্তে একটা লড়াই আমিও দেব!" জবাব দিলেন হেরম্যান।

"কীভাবে লড়বেন?"

সুদীপ্তকে একটু চমকে দিয়ে হেরম্যান তার পোশাকের নীচ থেকে একটা রিভলভার বের করে বললেন, "এটা দিয়ে। তবে এ জিনিসটা কিন্তু বেআইনি নয়, এটা এদেশে আনার ও সঙ্গে রাখার বৈধ অনুমতিপত্র আমার আছে। বন-জঙ্গল, পাহাড়ে ঘুরে বেড়াই তো, তাই আত্মরক্ষার্থে এটা কাছে রাখতে হয়। এ জিনিসটা তখন বের করিনি, কারণ, গুহার ভিতর থেকে বাইরের তিনটে রাইফেলের মোকাবিলা এটা করতে পারত না। আমাদের বাঁধতে নিশ্চয়ই কাউকে গুহার ভিতর খাঁচা খুলে ঢুকতে হবে। সে কাছে এলেই এটা তার কপালে চেপে ধরব। তারপর যা হয়, হবে।"

হেরম্যানের কথায় কিছুটা আশ্বস্ত হল সুদীপ্ত। অন্ধকার গুহায় বসে হেরম্যান একবার আক্ষেপের সুরে বললেন, "ওই শিকারির কথায় বিশ্বাস করে এখানে আসাটা চূড়ান্ত হঠকারী সিদ্ধান্ত হয়েছে! লামাও যদি কোনও ভাবে ব্যাপারটা জানতে পারতেন, তবে নিশ্চয়ই আমাদের উদ্ধারের চেষ্টা করতেন।"

অন্ধকার গুহায় সুদীপ্তরা রাই আর তার অনুচরদের ফিরে আসার প্রতীক্ষা করতে লাগলেন। সময় এগিয়ে চলল। সুদীপ্তরা খেয়াল করলেন, একসময় বাইরে ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল। চাঁদের আলোয় অসংখ্য রুপোলি রাংতার টুকরো যেন ভাসতে-ভাসতে নেমে আসছে পৃথিবীর বুকে। অপূর্ব সেই দৃশ্য! কিছুক্ষণের জন্য সুদীপ্তরা যেন গরাদের বাইরের সেই পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে ভুলে গেলেন তাঁদের বিপদের কথা। এমনই আশ্চর্য সুন্দর সেই দৃশ্য।

হঠাৎ গুহার বাইরে কীসের অস্পষ্ট একটা শব্দে হুঁশ ফিরল সুদীপ্তদের। একটা অস্পষ্ট খসখস আওয়াজ। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "ওরা মনে হয় ফিরে আসছে!" সতর্ক ভাবে মেঝে ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন তাঁরা দু'জন। আর তারপরই তাঁরা দেখতে পেলেন তাকে। না তাঁরা নয়। গুহামুখের বাইরে কিছুটা তফাতে দেওয়ালের গা ঘেঁসে বরফের সঙ্গে মিশে দাঁড়িয়ে আছে প্রাণীটা! উজ্জ্বল সবুজ চোখে গুহার ভিতর তাকিয়ে আছে সে। ওই উজ্জ্বল চোখটাই প্রাণীটার উপস্থিতি বুঝিয়ে দিল সুদীপ্তদের। একটা পূর্ণবয়স্ক তুষারচিতা! প্রাণীটা সম্ভবত টের পেয়েছে সুদীপ্তদের উপস্থিতি। গুহার দিকে তাকিয়ে সম্ভবত অচেনা মানুষদের প্রতি আক্রোশে সামনের পা দিয়ে তুষার খুঁড়ছে সে। ওরই শব্দ কানে এসেছে সুদীপ্তদের।

প্রাণীটা এর পর ধীরে-ধীরে এগিয়ে আসতে লাগল গুহার দিকে। সামান্য খুঁড়িয়ে হাঁটছে প্রাণীটা। সুদীপ্তরা বুঝতে পারলেন, এটাই সেই চিতাটা। যার টোপ হিসেবে ব্যবহার করার জন্য তাঁদের এখানে আটকে রেখেছেন রাইরা। বাতাসে মানুষের গন্ধ প্রাণীটাকে এখানে টেনে এনেছে। সে যত এগিয়ে আসতে লাগল, তত তার গলা দিয়ে বেরিয়ে আসা চাপা ঘরঘর শব্দও কানে আসতে লাগল। মানুষের প্রতি আক্রোশে ফুঁসছে চিতাটা।

গুহার কয়েক হাত তফাতে এসে পাথরের মূর্তির মতো স্থির হয়ে গেল প্রাণীটা। চাঁদের আলোয় সুদীপ্ত দেখতে পেল তার লেজের ডগাটা শুধু মৃদু-মৃদু নড়ছে। তার জ্বলন্ত চোখ দুটো দিয়ে যেন তীব্র ঘৃণা ঠিকরে বেরোচ্ছে মানুষের প্রতি। যদিও সুদীপ্ত আর চিতাটার মাঝে ইস্পাতের বেড়া আছে, তবুও হেরম্যান উত্তেজনায় রিভলভারটা বের করে আনলেন।

কয়েকটা মুহূর্ত মাত্র। আর তারপরই চিতাটা লাফিয়ে পড়ল গুহামুখে খাঁচাটার উপর। তার ভারী শরীরের আঘাতে ঝনঝন করে উঠল লোহার খাঁচাটা। কেঁপে উঠলেন সুদীপ্তরা। বাধা পেয়ে আরও খেপে গেল প্রাণীটা। কিছুটা পিছিয়ে গিয়ে দ্বিগুণ আক্রোশে আবার সে ঝাঁপ দিল গরাদে। আরও জোরে শব্দ করে উঠল খাঁচাটা।

প্রাণীটা মনে হয় হাল ছাড়ার পাত্র নয়, দ্বিতীয়বারের বাধাও তাকে দমাতে পারল না। ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আবারও সে পিছিয়ে গেল। তবে এবার সঙ্গে-সঙ্গে ঝাঁপ দিল না। ঝাঁপ দেওয়ার আগে কোথায় আঘাত করলে খাঁচাটা ভাঙা যেতে পারে, সেটা মনে হয় বোঝার চেষ্টা করতে লাগল চিতাটা। মুখটা খোলা তার। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তার হিংস্র দাঁতগুলো! ঠিক এই সময় আরও একটা শব্দ কানে এল সুদীপ্তদের। ছাদের উপর ধপ করে কী একটা শব্দ হল। সেই শব্দ শুনেই সম্ভবত চিতাটাও মাথা উঁচু করে তাকাল ছাদের দিকে। আর কয়েক মুহূর্তের মধ্যেই চিতাটার আচরণে অদ্ভুত এক পরিবর্তন ধরা পড়ল সুদীপ্তদের চোখে। তুষারচিতাটা গুহার ছাদের উপর কোনও কিছু একটা লক্ষ করে মুখ দিয়ে একটা আদুরে শব্দ করে লেজ নাড়তে শুরু করল। পোষা কুকুর মালিককে দেখলে যেমন আচরণ করে, চিতাটার আচরণ অনেকটা সেইরকম। গুহার ভিতর মানুষদের প্রতি যেন আর কোনও আকর্ষণ নেই তার। বেশ কিছুক্ষণ ওরকম করার পর প্রাণীটা একবার গুহার দিকে তাকিয়ে খোঁড়াতে-খোঁড়াতে গুহার সামনের রাস্তা ধরে দূরে অদৃশ্য হয়ে গেল।

ব্যাপারটা কী হল, সুদীপ্তরা ঠিক বুঝতে পারল না। হেরম্যান চাপা স্বরে বললেন, "লামা কি এখানে এসে উপস্থিত হলেন নাকি?" তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই এক অদ্ভুত ঘটনা দেখতে পেলেন তাঁরা। চাঁদের আলোয় ছাদের মাথা থেকে নেমে এল বিরাট বড় দু'টো রোমশ হাত! সুদীপ্তরা প্রথমে ঘাবড়ে গেলেও বুঝতে পারলেন, ঠিক এইরকম বিরাট দস্তানাই লামা বাক্স থেকে বের করে দেখিয়েছিলেন তাঁদের। লামাকে দেখা যাচ্ছে না, শুধু তাঁর হাত দু'টোই ঝুলন্ত অবস্থায় দেখা যাচ্ছে। সুদীপ্ত উৎফুল্ল ভাবে বলে উঠল, "লামা এসে গিয়েছেন! আর চিন্তা নেই!"

হাত দু'টো এর পর লোহার গরাদ ধরে ঝাঁকাতে শুরু করল। কিছুক্ষণের মধ্যেই টং করে একটা ধাতব শব্দ হল। একটা গরাদ ভেঙে ফাঁক হয়ে গেল! সুদীপ্ত আর হেরম্যান সঙ্গে-সঙ্গে ছুটে এসে সেই ভাঙা গরাদটাকে এক যোগে চাপ দিতে শুরু করল। হাতটা সঙ্গে-সঙ্গে উপরে উঠে গেল। গরাদ ঠেলতে-ঠেলতে হঠাৎ সুদীপ্ত দেখতে পেল, গরাদের বাইরে সাদা বরফের উপর চাঁদের আলোয় একটা কালো ছায়া এসে পড়েছে। বেশ লম্বা একটা ছায়া। গুহার ছাদের উপর দাঁড়ানো কোনও মানুষ যেন চাঁদের আলোয় ছায়া হয়ে ধরা দিচ্ছে বরফে।

সুদীপ্ত আর হেরম্যানের চেষ্টায় কিছুক্ষণের মধ্যেই অনেকটা ফাঁকা হয়ে গেল ভাঙা গরাদটা। একটু কসরত করে একে-একে তারা দু'জন সেই ফাঁকে গলে বাইরে বেরিয়ে এল। বরফের উপর ছায়াটা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছে। গুহার ছাদের উপরও কেউ নেই! ছাদের দিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত হাঁক দিল, "লামা ডং, লামা রিম্পুচি কোথায় আপনি?" বারদুয়েক ডাকার পরও যখন তাঁর সাড়া মিলল না, তখন হেরম্যান সুদীপ্তকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, "আর চিৎকার করবেন না, রাইরা সম্ভবত কাছেই আছে, সেই জন্য তিনি আত্মগোপন করলেন। চিৎকার করলে আমরা ধরা পড়ে যেতে পারি।"

সুদীপ্ত বলল, "তা হলে আমরা এখন কী করব?"

হেরম্যান তাঁর হাতের রিভলভারটা উঁচিয়ে ধরে চারপাশে তাকিয়ে নিয়ে বললেন, "মঠে ফেরার চেষ্টা করব, এবার আমাদের আটকানো সহজ হবে না। মঠের ভিতর ঢুকতে পারলে আমরা অনেক নিরাপদ।"

ঝিরিঝিরি তুষারপাত শুরু হল আবার। একদিকে খাদ, অন্য দিকে অনেক উঁচু পাথরের দেওয়ালের গা ঘেঁষে রিভলভার উঁচিয়ে সন্তর্পণে মঠে যাওয়ার জন্য এগোতে থাকল দু'জনে। কিছু দূর এগোতেই তারা দেখতে পেল, বরফের উপর কী যেন পড়ে আছে! চাঁদের আলোয় সেটা চিকচিক করছে। কাছে গিয়ে জিনিসটা কুড়িয়ে নিয়ে দেখা গেল, সে জিনিসটা একটা রাইফেলের ব্যারেল অর্থাৎ নল। সেটাকে রাইফেলের বাঁটের থেকে বিচ্ছিন্ন করে কে যেন দুমড়ে-মুচড়ে দিয়েছে। কিছুটা তফাতে পড়ে থাকা ভাঙা বাঁটটাও এর পর দেখলেন তাঁরা। হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "রাইফেলটা সম্ভবত রাইদের কারও হবে। কিন্তু এটার এমন দশা করল কে?"

এগোতে-এগোতে একটা বাঁকের মুখে পৌঁছল তারা। আর এর পরই সুদীপ্তরা দেখতে পেল রাইয়ের সঙ্গী সেই শিকারিকে। আতঙ্কিত চোখে উদভ্রান্তের মতো সংকীর্ণ রাস্তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে আছে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। হঠাৎ সে লোকটা তাকাল সুদীপ্তরা যে দেওয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছে, তার মাথার দিকে। আর তারপরই প্রচণ্ড আতঙ্কে দুর্বোধ্য একটা আর্তনাদ করে সোজা লাফ দিল রাস্তার পাশে অতল খাদের ভিতর। সুদীপ্তর মুহূর্তের জন্য যেন মনে হল, যখন লোকটা আর্তনাদ করে উঠল, ঠিক তখনই যেন একটা ছায়া এসে পড়েছিল বরফের উপর। একটা মানুষের আকৃতির ছায়া। হতে পারে ব্যাপারটা নিছক সুদীপ্তর মনের ভুল, তবুও সে একবার ঘাড় ঘুরিয়ে মাথার উপরটা দেখার চেষ্টা করল। কিন্তু দেওয়ালটা এত উঁচু যে, তার মাথার উপর কেউ দাঁড়িয়ে থাকলে নীচ থেকে তাকে দেখা সম্ভব নয়।

আবার এগোতে থাকল তারা। তুষারপাত হয়েই চলেছে। কুচি-কুচি বরফে ঢেকে যাচ্ছে পোশাক। চলার গতি শ্লথ হয়ে যাচ্ছে তাদের। তবুও চলতে-চলতে একটা সময় তারা পৌঁছে গেল মঠে ওঠার রাস্তার কাছে।

॥ ১১ ॥

একটা বাঁক নিলেই মঠে ওঠার রাস্তা। সেই বাঁকটা নিয়েই সুদীপ্তরা হঠাৎ মুখোমুখি হল রাইয়ের। তাঁর বন্দুকের নল সোজা সুদীপ্তদের দিকে তাক করা। রাইয়ের চোখে একটা হিংস্র ভাব। সুদীপ্তদের দেখে পৈশাচিক হেসে বললেন, "খেলা কিন্তু এখনও শেষ হয়নি। আমার দু'টো লোক খাদে পড়ল ইয়েতি সাজা লামাটার ভয়ে। কিন্তু আমাকে ঠকানো সহজ নয়, এবার আমি বদলা নেব।"

হেরম্যানের হাতের রিভলভারও রাইয়ের দিকে তাক করা। মাঝে কুড়ি ফুটের মতো ব্যবধান। কোনও পক্ষেরই কোনও দিকে পালাবার উপায় নেই, একদিকে পাথুরে দেওয়াল, অন্যদিকে অন্ধকার খাদ। অসহ্য রুদ্ধশ্বাস কয়েকটা মুহূর্ত! গুলি চালানোর আগের মুহূর্তে হেরম্যান আর রাই পরস্পরকে জরিপ করে নিচ্ছেন। দু'জনের হাতের আঙুলই ধীরে-ধীরে চেপে বসতে যাচ্ছে ট্রিগারের উপর। ঠিক এই সময়ই পাথুরে দেওয়ালের উপর থেকে একটা সাদা বিদ্যুৎ যেন উড়ে এসে পড়ল রাইরের ঘাড়ে। রাই আর হেরম্যান, দু'জনেরই হাতের আঙুলই মনে হয় শেষ মুহূর্তে চেপে বসে ছিল ট্রিগারে। প্রচণ্ড শব্দে কেঁপে উঠল চারপাশ। কিন্তু দু'জনের গুলিই লক্ষ্যভ্রষ্ট হল ওই উড়ে আসা বিদ্যুতের জন্য। সুদীপ্তরা দেখলে পেলেন, উপর থেকে নেমে আসা তুষারচিতাটা রাইকে পেড়ে ফেলেছে মাটিতে। প্রাণীটা আর রাইয়ের মধ্যে শুরু হল প্রবল ধস্তাধস্তি। রাই এক হাতে গলা চেপে ধরেছে প্রাণীটার আর সেও চার হাত-পায়ের আঘাতে ফালা-ফালা করে দিচ্ছে রাইয়ের পোশাক। সুদীপ্তদের কিছু করার নেই, নীরব দর্শকের মতো তারা দেখতে লাগল সেই ভয়ংকর লড়াই। কিন্তু অসীম ক্ষমতা আর সাহস বটে রাইয়ের। হঠাৎ সে চিতাটার পেটের নীচে পা গলিয়ে প্রচণ্ড লাথিতে তাকে ছিটকে ফেলল খাদে।

প্রাণীটা নীচে পড়তে-পড়তেও দু'টো থাবা দিয়ে খাদের কিনার ধরে ঝুলতে লাগল। রাই উঠে দাঁড়ালেন। সারা দেহ তাঁর রক্তাক্ত। কিন্তু উঠে দাঁড়িয়েই তিনি হেরম্যানের রিভলভারের সামনে পড়ে গেলেন। চিতাটার সঙ্গে লড়াইয়ের সময় তাঁর হাতের রাইফেল ছিটকে পড়েছে খাদে। চিতাকে লড়াইয়ে হারালেও হেরম্যানের হাতের অস্ত্রটা দেখে কিন্তু সত্যিই ভয় পেয়ে গেলেন রাই। তিনি আর না দাঁড়িয়ে ছুটতে শুরু করলেন মঠে ওঠার রাস্তায়। সুদীপ্তরাও তাঁর পিছু ধাওয়া করল। রক্তাক্ত অবস্থাতেও সুদীপ্তদের চেয়ে দ্রুতগতিতে ছুটছেন রাই, ব্যবধান প্রতি মুহূর্তেই বাড়ছে। আসলে সুদীপ্তরা তো তাঁর মতো এ অঞ্চলে ছোটাছুটিতে অভ্যস্ত নয়। তাদের পা বসে যাচ্ছে নরম তুষারে। ছুটতে-ছুটতে রাই একসময় উঠে পড়লেন মঠ চত্বরে। আর তাঁর পিছন-পিছন সুদীপ্তরা।

ঠিক এই সময় সুদীপ্তদের পাশ দিয়ে বাতাস কেটে রাইয়ের দিকে ছুটে গেল সেই তুষারচিতাটা। রাইয়ের মতো মরণকে ফাঁকি দিয়ে ঝুলতে থাকা অবস্থায়ও শেষ পর্যন্ত উপরে উঠে এসেছে। তাঁদের তিনজনকে অনুসরণ করে সেও এখানে পৌঁছে গিয়েছে রাইয়ের উপর প্রতিশোধ নিতে। মঠ চত্বরে চোর্তেনের কাছে পৌঁছে থমকে একবার পিছনে ফিরলেন রাই। তিনি দেখতে পেয়ে গেলেন ধাবমান চিতাটাকে।

তাই দেখে তিনি যেন মঠের দরজার দিকে পা বাড়াতে গিয়েও শেষ পর্যন্ত প্রাণ বাঁচাতে ছুটলেন পাথুরে দেওয়ালের গায়ের সেই গুহার দিকে। তুষারচিতাটাও তুষারবৃষ্টির মধ্যে ছুটল সে দিকে। রাই তখন গুহাটার প্রায় কাছাকাছি পৌঁছে গিয়েছেন, কিন্তু চিতাটারও তাঁকে ধরতে আর একটা মাত্র লাফ বাকি, হঠাৎ রাইফেলের গর্জনে কেঁপে উঠল চারদিক। আর তারপরই চিতাটা যেন শূন্যে ডিগবাজি খেয়ে ছিটকে পড়ল মাটিতে। সে আর উঠল না। আর রাইও অদৃশ্য হয়ে গেলেন অন্ধকার গুহার ভিতর।

দাঁড়িয়ে পড়লেন সুদীপ্ত আর হেরম্যান। গুলিটা কে চালাল, বোঝার চেষ্টা করলেন তাঁরা। তখনও রাইফেলের গর্জন প্রতিধ্বনিত হচ্ছে এ পাহাড় থেকে সে পাহাড়ে। সুদীপ্তদের চোখ গেল মঠের তোরণের দিকে। সেখানে দাঁড়িয়ে আছে দীর্ঘকায় এক ছায়ামূর্তি। তার হাতে ধরা রাইফেলের নলটা চাঁদের আলোয় চিকচিক করছে। তা হলে লামাই বেরিয়ে এসে গুলিটা চালালেন!

রাইফেল নামিয়ে সে লোকটা এর পর চত্বরের মধ্যে এগিয়ে আসতে শুরু করল। সে কিছুটা এগোবার পরই তার পোশাক দেখে সুদীপ্ত বুঝতে পারল, এ লোকটা লামা নন, বীরবাহাদুর! সুদীপ্তরাও এগোল তাঁর দিকে।

বীরবাহাদুরের মুখোমুখি হয়ে হেরম্যান বিস্মিত ভাবে বলে উঠলেন, "আপনি ফিরে এসেছেন! কেন?"

বীরবাহাদুরের চোখেও কম বিস্ময় নয়। তিনি বললেন, "কেন এলাম, পরে বলছি। কিন্তু আপনারা এতক্ষণ কোথায় ছিলেন? লামা বললেন, রাই নাকি চিতার কামড়ে আহত। আপনারা তাকে দেখতে গিয়ে আর ফেরেননি! কিন্তু রাইকে দেখে তো কিছু..."

তাঁর কথা শেষ করার আগেই হেরম্যান অতি সংক্ষেপে ব্যাপারটা বোঝানোর জন্য বললেন, "রাই ফাঁদ পেতে আমাদের নিয়ে গিয়ে আটকে ফেলেছিলেন লোহার গরাদ বসানো এক গুহায়। ওই গুহায় চোরাই জিনিসপত্র রাখেন রাইরা। তাঁর ইচ্ছে ছিল, আমাদের বেঁধে চিতাটার টোপ করবেন। কিন্তু আমাদের আটকে রাখার পর তিনি ফেরার আগেই পালাই আমরা। তবে ফেরার পথে আবার হঠাৎ মুখোমুখি হই ওঁর। রাই আমাদের গুলি করার আগেই আত্মগোপনকারী চিতাটা আক্রমণ করে ওঁকে। চিতাটাকে ছিটকে ফেলে রাই এখানে পালিয়ে আসে। তারপর..."

বীরবাহাদুরের সঙ্গে কথা বলতে-বলতে তারা গিয়ে দাঁড়াল গুহার মুখে। বীরবাহাদুরের গুলি খেয়ে চিতাটা সেখানে পড়ে আছে। তুষারপাতে ধীরে-ধীরে ঢেকে যাচ্ছে তার দেহ। প্রকৃতির সন্তানকে যেন নিজের বুকে পরম মমতায় লুকিয়ে ফেলছে প্রকৃতি। চিতাটার দিকে তাকিয়ে আক্ষেপের সুরে বীরবাহাদুর বললেন, "ওকে মারতে

খুব খারাপ লাগল। কিন্তু এ ছাড়া কোনও উপায় ছিল না। তবে ওর খেপে যাওয়ার পিছনে কিন্তু প্রাণীটার নিজের দোষ ছিল না। রাইয়ের মতো মানুষদের লোভই এর জন্য দায়ী। লামা আমাকে আজ সব বলেছেন।"

সুদীপ্ত বলল, "হ্যাঁ, আমাদেরও বলেছেন। তবে আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, রাই যে-কোনও মুহূর্তে বেরিয়ে আসতে পারেন!" ব্যাপারটা হয়তো কাকতালীয়, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে গুহার ভিতর থেকে টলতে-টলতে বেরিয়ে এলেন রাই। তাঁর চোখ দু'টো যেন ঠিকরে বাইরে বেরিয়ে আসতে চাইছে, মুখ ফুলে উঠেছে। সব রক্ত যেন জমা হয়েছে তাঁর মুখে। মুখ ফাঁক করে আগের সেই শেরপাটার মতোই এক মুঠো বাতাসের জন্য হাঁকুপাঁকু করছেন! তিনি বেরিয়ে আসতেই তাঁর দিকে রিভলভার তাক করলেন হেরম্যান। কিন্তু রাইকে বাগে আনতে কোনও কিছুরই আর প্রয়োজন হল না। কয়েক পা এগিয়েই রাই হুমড়ি খেয়ে চিতাটার পাশে পড়ে গেলেন। সুদীপ্তরা ঝুঁকে পড়লেন তাঁর উপর। বীরবাহাদুর রাইয়ের মুখটা ঘুরিয়ে তাঁকে ঝাঁকুনি দিয়ে বললেন, "কী হয়েছে তোমার? গুহার ভিতর কী আছে?"

তাঁর কণ্ঠস্বর শুনে মুহূর্তের জন্য একবার চোখ খুলে রাই অস্পষ্ট স্বরে বললেন, "গ্যাস! নাইট্রোজেন!" তারপরই সংজ্ঞা হারালেন রাই।

বীরবাহাদুর বললেন, "তার মানে প্রাকৃতিক নাইট্রোজেন গ্যাসের ভাণ্ডার আছে এখানে। ওই শেরপাটা মুখ দিয়ে গ্যা গ্যা শব্দ করে গ্যাস কথাটাই বলতে চাইছিল!"

সুদীপ্ত বলল, "এখন আমাদের কী করা উচিত?"

হেরম্যান বললেন, "লামা বাইরে থেকে মঠে ফিরে না আসা পর্যন্ত মঠেই তাঁর জন্য অপেক্ষা করি।"

হেরম্যানের কথা শুনে বীরবাহাদুর বললেন, "বাইরে থেকে ফেরা মানে? উনি তো মঠের বাইরে যাননি। তবে এখন চলে যাবেন। আমি তাঁর থেকে বিদায় নিয়ে এই তো এখন বাইরে বেরলাম। তারপর এই কাণ্ড!"

বিস্মিত সুদীপ্ত বলল, "লামা বাইরে যাননি মানে? তিনিই তো ওই চামড়ার পোশাক পরে গুহার ছাদ থেকে হাত বাড়িয়ে গরাদটা প্রথমে ভাঙলেন। তাঁকে আমরা দেখতে না পেলেও ইয়েতির দস্তানা পরা হাত, তাঁর ছায়া বরফের উপর স্পষ্ট দেখেছি।"

বীরবাহাদুর বললেন, "তা কী করে সম্ভব? আপনারা যখন মঠ ছেড়ে বেরচ্ছেন, তখন আমি আপনাদের দূর থেকে দেখতে পেয়েছিলাম। আর তারপরই আমি মঠে এসে ঢুকেছিলাম। লামা মঠেই ছিলেন। তাঁর সঙ্গেই তো আমি মঠে এতক্ষণ ছিলাম। আপনাদের ওখানে যাওয়া তো দূরের কথা, একবারের জন্যও তিনি ঘর থেকে বেরোননি।"

তাঁর কথা শেষ হওয়ার সঙ্গে-সঙ্গে হেরম্যান বেশ উত্তেজিত ভাবে বলে উঠলেন, "এ ধাঁধার সমাধান একমাত্র লামা রিম্পুচিই করতে পারবেন। উনি মঠ ছেড়ে যাওয়ার আগেই এ ব্যাপারে ওঁর সঙ্গে একবার কথা বলা দরকার," এই বলে তিনি ছুটলেন মঠের দিকে। তাঁকে অনুসরণ করলেন সুদীপ্ত আর বীরবাহাদুর।

ভিতরে ঢুকে প্রার্থনাকক্ষের বন্ধ দরজার সামনে এসে দাঁড়ালেন সকলে। হেরম্যান উত্তেজিত ভাবে লামার উদ্দেশে বললেন, "লামা রিম্পুচি? আপনি কি ভিতরে আছেন? আপনার সঙ্গে কিছু জরুরি কথা বলতে চাই।"

বার কয়েক ডাকার পরও যখন তাঁর কোনও সাড়া মিলল না, তখন দরজায় ধাক্কা দিতেই কপাট খুলে গেল। ভিতরে বুদ্ধমূর্তির সামনে একটা প্রদীপ জ্বলছে। কিন্তু লামাকে সেখানে দেখতে পেলেন না তাঁরা। মূর্তির কাছাকাছি পৌঁছতেই সুদীপ্তর প্রথমে যা নজরে এল, তা হল বেদির গায়ে ঝুলতে থাকা ভালুকের চামড়ার সেই পোশাকটা! রাজার মাথাটা বা লাল শালুমোড়া পুঁথিটা আর অবশ্য নেই। বাক্সটার ডালা খোলা, তার ভিতরটা শূন্য।

হেরম্যান, বীরবাহাদুরকে জিজ্ঞেস করলেন, "আচ্ছা, এই ইয়েতির পোশাক-দস্তানা, পায়ের ছাপওয়ালা জুতোগুলো কি এখানেই ছিল?"

বীরবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ, আমি ঘরে ঢোকার পর থেকে এগুলো এমন ভাবেই এখানে ছিল। পুঁথি আর রাজার মাথাটাও ছিল।" ঠিক এই সময় সুদীপ্ত খেয়াল করল, বেদির উপর বুদ্ধমূর্তিটা যেন একপাশে বেশ কিছুটা সরে গিয়েছে। সুদীপ্ত ব্যাপারটা ভাল করে দেখার চেষ্টা করতেই তার চোখে পড়ল সরে যাওয়া বুদ্ধমূর্তির নীচে দেখা যাচ্ছে একটা বেশ বড় গহ্বর। একজন মানুষ অবশ্যই প্রবেশ করতে পারে সেখানে। বীরবাহাদুর বেদির সেই ফোকরে টর্চের আলো ফেলতেই দেখা গেল থাক-থাক পাথুরে সিঁড়ি নেমে গিয়েছে ভিতরে। হেরম্যান তাঁর টর্চের আলোটা প্রার্থনাকক্ষের চারপাশে ঘুরিয়ে নিয়ে লামা ঘরের কোথাও আছেন কি না তা দেখে নিয়ে বললেন, "লামা সম্ভবত এই গহ্বরের পথেই গিয়েছেন, চলুন নীচে নামা যাক।"

সুদীপ্তরা এর পর একে-একে প্রবেশ করল সুড়ঙ্গে। সিঁড়ি বেয়ে বেশ অনেকটা নীচে নামল তারা। সামনে আরও-একটা লম্বা সুড়ঙ্গ। সেই সুড়ঙ্গের দেওয়ালে টর্চের আলো পড়তেই ফুটে উঠছে নানা অলঙ্করণ। কোথাও বা বুদ্ধমূর্তি, কোথাও জাতক কাহিনির নানা দৃশ্য, কোথাও আবার বৌদ্ধ ধর্মের নানা উপাচারের দৃশ্যাবলী। অবাক হয়ে সেগুলো দেখতে-দেখতে সুড়ঙ্গ ধরে এগোতে থাকলেন তাঁরা। তবে ছবিগুলো অনেক পুরনো। হেরম্যান মন্তব্য করলেন, "এসব ছবি কম সে কম তিন-চারশো বছরের পুরনো হবে।"

বেশ কিছুক্ষণ ধরে এগোনোর পর একটা প্রাচীন কাঠের দরজার সামনে এসে উপস্থিত হল তারা। সেই দরজার মাথায় টর্চের আলো পড়তেই থমকে দাঁড়ালেন সকালে। একটা ছবি আঁকা আছে সেখানে। অদ্ভুত এক ছবি। বানর জাতীয় বিরাট এক রোমশ প্রাণী বসে আছে একটা বেদির উপর, আর তাকে ঘিরে বসে আছেন উপাসনারত মুণ্ডিতমস্তক লামার দল। প্রাণীটার কাছে মানুষগুলোকে আকৃতিতে নেহাতই বামন বলে মনে হচ্ছে। হেরম্যান বিস্মিত ভাবে বললেন, "এ ছবিটা কীসের ইঙ্গিত দিচ্ছে, তা বুঝতে পারছ নিশ্চয়ই। ছবিটা কি নিছক কল্পনা করে এঁকেছিলেন প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা, নাকি এ ছবির মধ্যে সত্যি লুকিয়ে আছে?"

সুদীপ্তরা দরজা ঠেলে ভিতরে প্রবেশ করল। সে জায়গাটা বেশ বড় একটা গুহার মতো ঘর। অনেক ক'টা সুড়ঙ্গ নানা দিকে চলে গিয়েছে সে ঘর থেকে। হেরম্যান আর বীরবাহাদুর তাঁদের টর্চের আলো চারপাশে ঘোরাতেই ঘরটা দেখে বিস্মিত হয়ে গেল সকলে। অসংখ্য পাথরের তৈরি নল এ দেওয়াল ও দেওয়াল বেয়ে গিয়ে মিলেছে ঘরের ঠিক মাঝে একটা বেদির উপর রাখা বিরাট বড় স্ফটিকের তৈরি চৌবাচ্চার গায়ে। সে ঘরের সারা মেঝে আর দেওয়ালের গায়ের তাক জুড়ে রয়েছে অদ্ভুত আকৃতির নানা পাত্র। তাদের কোনটা স্বচ্ছ পাথরের যন্ত্রপাতি। কয়েকটা ধাতব নলও আছে চৌবাচ্চার গায়ে। ঘরের চারপাশে তাকিয়ে হেরম্যান বললেন, "দেখে মনে হচ্ছে এটা প্রাচীন কোনও গবেষণাগার!"

তবে ঘরটা কিন্তু প্রচণ্ড ঠান্ডা। তুষারপাতের মধ্যে ঘুরে বেড়াবার সময়ও কিন্তু এত ঠান্ডা লাগেনি সুদীপ্তর। হাড় কেঁপে যাচ্ছে, এমন ঠান্ডা ঘর! টর্চের আলোয় ধরা পড়ল দেওয়ালের চারপাশে কয়েকটা কুলুঙ্গিতে বেশ কয়েকটা বড়-বড় প্রদীপ রাখা আছে। সুদীপ্ত একটা প্রদীপ হাতে নিয়ে বুঝতে পারল, প্রদীপগুলো এখনও জ্বালানো হয়। ব্যাপারটা দেখে হেরম্যান ঘরের দেওয়ালের চারপাশে ঘুরে-ঘুরে লাইটার দিয়ে একে-একে সব প্রদীপগুলো জ্বালিয়ে দিলেন। বেশ আলোকিত হয়ে উঠল ঘরটা। আরও ভাল করে ঘরটা এবার দেখে তিনজনেই বুঝতে পারল, সত্যিই এটা একটা ল্যাবরেটরি। সুদীপ্তর মনে হল, ঘরের মাঝখানে এগোতে-এগোতে বীরবাহাদুর নিজের মনেই বললেন, "আমি এরকমই কিছু একটা অনুমান করেছিলাম।"

কয়েক পা এগিয়ে একটা ছোট পাথরের টেবিলের উপর চোখ আটকে গেল সুদীপ্তর। সেখানে রাখা আছে বেশ কয়েকটা পুরনো পুঁথি আর সেই বইটা, ক্রায়োনিক্স-ক্রয়োজেনিক্স।

সুদীপ্ত সঙ্গে-সঙ্গে বলে উঠল, "আরে, দেখুন লাইব্রেরি থেকে

নিখোঁজ সেই বইটা!"

হেরম্যান বইটা হাতে উঠিয়ে নিয়ে বললেন, ক্রায়োনিক্স শব্দের মানেটা এবার মনে পড়েছে। ক্রায়োজেনিক্সের যে পদ্ধতিতে প্রাণীর শরীরকে বছরের পর-বছর ধরে অক্ষত রাখতে পারে, তাকে বলে ক্রায়োনিক্স। কেউ-কেউ বলেন ক্রায়োনিক্স সাহায্যে কোনও জীবন্ত প্রাণীকে বছরের পর-বছর শীতঘুমে রাখা যেতে পারে, পরে আবার তাকে জীবন্ত করা যেতে পারে। কী, ঠিক বললাম তো?" এই বলে হেরম্যান মৃদু হেসে তাকালেন বীরবাহাদুরের দিকে।

বীরবাহাদুর হেরম্যানের কথা শুনে একটু হকচকিয়ে গিয়ে বললেন, "হ্যাঁ, ঠিক তাই।"

হেরম্যান এর পর তাঁকে বললেন, "আপনার কাছে ক্রায়োজেনিক্সের বই, আর এখানেও ক্রায়োজেনিক্সের বই, এ দুইয়ের মধ্যে কোথাও যেন একটা সম্পর্ক আছে তাই না? আমার অনুমান লামা হলেন আপনার..."

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বীরবাহাদুর বললেন, "হ্যাঁ, লামা রিম্পুচি আমার বৃদ্ধ পিতামহ। কিন্তু ব্যাপারটা আপনি আন্দাজ করলেন কীভাবে?"

হেরম্যান জবাব দিলেন, "আপনার প্রপিতামহর বৌদ্ধ সন্ন্যাসী হয়ে যাওয়ার গল্প, তার সঙ্গে আপনার পিতামহর দেখা করতে আসা, আপনার গোপনে তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ। সর্বোপরি আপনাদের দু'জনের উচ্চতা ও দৈহিক গঠনের মধ্যে অদ্ভুত এক সাদৃশ্য, এসব মিলিয়ে-মিশিয়ে আমি ব্যাপারটা আন্দাজ করেছিলাম। পুরো ব্যাপারটা সম্বন্ধে, আপনি কিছুটা আলোকপাত করবেন কি? তবে তার আগে ভাল করে দেখে নেই ঘরটা," এই বলে হেরম্যান এগোলেন ঘরের মাঝখানে বেদির দিকে।

হেরম্যানের কথায় স্মিত হেসে বীরবাহাদুর তাঁর সঙ্গে পা মেলালেন।

সুদীপ্তরা এসে দাঁড়ালেন ঘরের মাঝখানে সেই বেদিটার সামনে। তার উপর রাখা আছে স্বচ্ছ স্ফটিকের তৈরি লম্বা বাক্সটা। লম্বায় সেটা অন্তত বারো ফুট, চওড়ায় চার ফুট হবে। বাক্সের ডালাটা তার পিছনেই রাখা। বাক্সের ভিতরের দেওয়ালের চারপাশেও অসংখ্য সরু-সরু পাথরের নল বসানো। টর্চের আলোয় বাক্সের গায়ের দাগ দেখে সুদীপ্তদের অনুমান হল, একসময় বাক্সটা কোনও ধরনের তরল বা গ্যাসে পূর্ণ ছিল। সারা ঘরের দেওয়ালে যে নলগুলো আছে, তার মাধ্যমেই কোনও তরল বা গ্যাসীয় পদার্থ জমা হত এই বাক্সে। হঠাৎ বাক্সের কোনায় পড়ে থাকা কী একটা জিনিস তুলে আনলেন হেরম্যান। এক গোছা বেশ বড় লোম। পকেট থেকে সেই কাগজের মোড়কটা বের করে তার ভিতরের লোমগুলোর পাশে নতুন লোমগুলোকে রাখলেন। হুবহু একই লোম!

বীরবাহাদুর বলে উঠলেন, "আমি এরকমই একটা আন্দাজ করেছিলাম!"

"কী আন্দাজ?" প্রশ্ন করল সুদীপ্ত।

বীরবাহাদুর বললেন, "আমি যতটুকু অনুমান করতে পারছি আর পারিবারিক সূত্রে যতটুকু জানি, তা আপনাদের এবার বলি। দুর্গাবাহাদুর গৃহত্যাগ করে যে এ মাঠে এসেছিলেন, তা আমার পিতামহ জানতেন। তিনি তাঁর সঙ্গে মাঝে-মাঝে দেখা করতে আসতেন, আমার বাবাও কয়েকবার এসেছিলেন, কিন্তু মঠের ভিতর তাঁদের প্রবেশাধিকার ছিল না। দুর্গাবাহাদুর ওরফে লামা ডং রিম্পুচি তাঁদের সঙ্গে কুশল বিনিময় করে সদর দরজা থেকেই বিদায় দিতেন।

"প্রাথমিক অবস্থায় আমি পারিবারিক সূত্রে এখানে আমার প্রপিতামহর উপস্থিতির কথা জানলেও তাঁর সম্বন্ধে তেমন একটা আগ্রহ প্রকাশ করিনি। কিন্তু তাঁর রক্তই তো বইছে আমার শরীরে। সম্ভবত সেই কারণেই আমার মধ্যেও পড়াশোনা ও বিজ্ঞানচর্চার নেশা শুরু হয়। দুর্গাবাহাদুর আমাদের চিতওয়ানের হাভেলিতে একটা লাইব্রেরি আর একটা ল্যাবরেটরি তৈরি করেছিলেন। এ দু'টো প্রবল ভাবে আকৃষ্ট করতে শুরু করে আমাকে। এক-এক সময় আমার মনে একটা প্রশ্ন জাগত, যে মানুষটা পড়াশোনা আর বিজ্ঞানচর্চায় এত আগ্রহী ছিলেন, তিনি হঠাৎ সব ছেড়েছুড়ে নির্জনে দিন কাটাতে গেলেন কেন? শুধু ধর্মের টানে রানার দেওয়া পুঁথি পড়ে সন্ন্যাসী হয়ে গেলেন তিনি? এমন কী লেখা ছিল সেই পুঁথিতে? সৌভাগ্যক্রমে পুঁথির কয়েকটা পাতা ছিল আমার বাড়িতে। বড় হওয়ার পর সে পুঁথির পাতা পড়তে সক্ষম হই আমি। ওই ক'টা পাতায় কোনও এক প্রাচীন লামা যা লিখে গিয়েছিলেন তাঁর মর্মার্থ হল, হিমালয়ের কোলে কোনও এক মঠে তাঁরা ঘুম পাড়িয়ে রেখেছেন দেবরূপে পূজিত এক অতিমানবকে, যিনি অতীব শক্তিধর। একদিন তিনি শীতঘুম ভেঙে আবার জেগে উঠবেন। কীভাবে তাঁকে শীতঘুমে পাঠানো হয়েছিল, কীভাবে তাঁকে আবার জাগানো হবে, তা লেখা আছে ওই পুঁথিতে। যে পুঁথিটা বুদ্ধমূর্তির কোলে রাখা আছে দেখতেন, সেটাই ছিল ওই পুঁথি।"

এর পর একটু থেমে বীরবাহাদুর বললেন, "পুঁথির আসল পাতাগুলো দুর্গাবাহাদুর সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলেন, কিন্তু ওই তিনটে পাতাই আমার মনে রেখাপাত করে। 'শীতঘুমে অতিমানবকে রাখা হয়েছে মানে কী?' আর এর পরই তাঁর লাইব্রেরি ঘাঁটতে-ঘাঁটতে বেশ কিছু ক্রায়োজেনিক্স সম্পর্কিত বই পেয়ে যাই আমি। বইগুলো পেয়ে আমি দেখলাম, তার মধ্যে যেখানে-যেখানে ক্রায়োনিক্স সম্পর্কে, বিশেষত জীবদেহ সংরক্ষণের ব্যাপারে লেখা আছে, সেখানে-সেখানে কালি দিয়ে দাগিয়ে রেখেছেন তিনি। এমনিতে কিন্তু কোনও বইয়ে কালি দিয়ে দাগাবার অভ্যেস তাঁর ছিল না। আমি তাঁর বহু বই ঘাঁটাঘাঁটি করেছি।

"পুঁথির সেই 'শীতঘুম' আসলে কি তবে ক্রায়োনিক্স? একের পর-এক প্রশ্ন ঘুরপাক খেতে শুরু করে আমার মনে। ক্রায়োনিক্স, ক্রায়োজেনিসক্স নিয়ে আমি পড়াশোনাও শুরু করি। কিছু পরীক্ষাও চালাই। কিন্তু তাতে আমি সফল হইনি। মাঝখান থেকে এসব কাজ করতে গিয়ে প্রচুর ধারকর্জ হয়, রাইয়ের থেকে টাকা ধার করে ফাঁদে পড়ি আমি। সব দিক থেকে যখন আমি হতাশ হয়ে পড়েছিলাম, তখন দু'টো খবর আমার কানে আসে। এক, মিগু গুম্ফায় রাইয়ের অদ্ভুত অতিমানব দর্শন, আর মঠ ত্যাগ করে লামার অন্য জায়গায় চলে যাওয়ার উদ্যোগ। দ্বিতীয় খবরটা আমি পেয়েছিলাম নীচের গুম্ফায় এক পরিচিত সন্ন্যাসীর কাছে। তুষারদেশের রাজার মাথাটা এ মঠের থেকে দেওয়া-নেওয়ার জন্য তিনি এখানে আসা-যাওয়া করতেন, কিন্তু মঠে তাঁরও প্রবেশাধিকার ছিল না। আমি ঠিক করে নিই, লামা মঠ ত্যাগ করে চলে যাওয়ার আগে তাঁর সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করার চেষ্টা করব। যদি তাঁর থেকে কিছু উত্তর মেলে আমার প্রশ্নগুলোর। চিতাটাকে মারার সরকারি নির্দেশ আমাকে সে সুযোগ করে দেয়। ইতিমধ্যে রাইও এসে হাজির হয়। তার টাকা ফেরত দিতে না পারায় তাকে খুশি করতে কাজে নিতে বাধ্য হই আমি। তখন অবশ্য আমি জানতাম না যে, চিতাটাকে সে-ই গুলি করেছিল। যাই হোক, তাকে নিয়ে যাত্রা শুরু করি আমি। আমার সঙ্গে ছিল পুঁথির ক'টা পাতা। এখানে এসে গত রাতে তাঁর সঙ্গে প্রথম সাক্ষাৎ করি আমি। তারপর আজ আবার এসেছিলাম, কিন্তু আপনাদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।"

"আজ আবার এসেছিলেন কেন?" জানতে চাইল সুদীপ্ত।

বীরবাহাদুর বললেন, "গত কাল তো তেমন কোনও কথা হয়নি। আজ এসেছিলাম তাঁর সঙ্গে কথা বলার জন্য, আর পুঁথির পাতা ক'টা ফেরত দেওয়ার জন্য। তিনি পাতা ক'টা ফেরত দিতে অনুরোধ করেছিলেন। কারণ, ওই মাথাটা আর পুঁথিটাই শুধু তাঁর সঙ্গে যাবে বলে তিনি বলেছিলেন। আমার ধারণা ওই মাথাটাও সত্যিই তাদের কারও ছিল। আর কোনও প্রমাণ রেখে গেলেন না তিনি।"

হেরম্যান ব্যগ্র ভাবে বললেন, "কী-কী ব্যাপারে তাঁর সঙ্গে কথা হল? তবে কি ওই পুঁথি বা প্রাণীটার সম্বন্ধে কোনও কথা?"

বীরবাহাদুর জবাব দিলেন, "এখানকার নানা ব্যাপারেই তাঁর সঙ্গে কথা হল। তবে ওই পুঁথি বা প্রাণীটার প্রসঙ্গ উঠতেই তিনি বললেন, 'এ ব্যাপারে আমি কোনও আলোচনা করব না। যদি ওরকম কিছু

থেকেও থাকে, তবে তাকে সবার অগোচরেই থাকতে দেওয়া উচিত। গল্পগাথার প্রাণী হয়ে তার আড়ালেই বেঁচে থাকুক সে।'"

কথাগুলো বলে বেশ অনেকক্ষণ চুপ করে বাক্সটার দিকে তাকিয়ে থাকার পর বীরবাহাদুর বললেন, "এখন ব্যাপারটা আমার কাছে অনেকটাই স্পষ্ট। এই মঠসংলগ্ন গুহার মধ্যে আছে নাইট্রোজেন গ্যাসের প্রাকৃতিক ভাণ্ডার। আপনারা নিশ্চয়ই জানেন যে, ক্রায়োজেনিক্স বিদ্যার অন্যতম প্রধান উপাদান হল তরল হাইড্রোজেন আর হিলিয়াম। প্রাচীন বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা এই হাইড্রোজেনকে কাজে লাগিয়ে এই পাথরের আধারেই সম্ভবত ঘুম পাড়িয়ে রেখেছিলেন তাঁদের সেই অতিমানবকে। সভ্য পৃথিবীর বিজ্ঞানীদের অনেক আগেই তাঁরা আবিষ্কার করেছিলেন ক্রায়োনিক্সের কৌশল।"

হেরম্যান বললেন, "আমারও তাই অনুমান। এবার বুঝতে পারছি লামার মুখ কেন অমন ফোলা-ফোলা লাগত। ওই নাইট্রোজেন গ্যাস পূর্ণ গুহায় যাওয়া-আসার কৌশল রপ্ত করলেও গ্যাসের প্রভাব থেকে নিজেকে তিনিও সম্পূর্ণ মুক্ত রাখতে পারতেন না।"

বিস্মিত সুদীপ্ত বলে উঠল, "তা হলে আমরা বরফে কার ছায়া দেখলাম? কে আমাদের গরাদ ভেঙে মুক্ত করল?"

হেরম্যান বললেন, "সন্দেহ একটা আগেই আমার হয়েছিল। লামা যত শক্তিশালী মানুষই হোন না কেন, ওরকম একটা লোহার খাঁচা কি তিনি শুধু হাতে ভেঙে ফেলতে পারেন? বেঁকিয়ে ফেলতে পারেন রাইফেলের ব্যারেল? খাড়া দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠে যেতে পারেন?"

বীরবাহাদুর সুদীপ্তকে বললেন, "ও কাজগুলো যে করেছে সম্ভবত সে হল সেই প্রাণী, লামার কথামতো যে গল্পগাথার প্রাণী হয়েই বেঁচে থাকবে এই হিমালয়ের বুকে। যাকে কেউ ডাকে বড়-পা বলে, কেউ বলে ইয়েতি, কেউ বা বলে, বরফদেশের রাজা।"

॥ ১২ ॥

দিনদশেক পর কাঠমান্ডুর এক হোটেলে মুখোমুখি বসেছিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্তদের দলটা নির্বিঘ্নে সামিট করে, বেসক্যাম্প হয়ে গত কালই কাঠমান্ডু নেমেছে। তাদের সঙ্গেই নীচে নেমেছে সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্তরা আজই কলকাতায় ফেরার জন্য রওনা হবে আর হেরম্যানও ধরবেন দেশে ফেরার বিমান। বীরবাহাদুর চিতওয়ানে চলে গিয়েছেন দিন কয়েক আগে, আর রাই কোনও এক হাসপাতালে আছেন। গ্যাসের প্রভাবে পক্ষাঘাতগ্রস্ত হয়েছেন তিনি, আর কোনওদিন রাইফেল ধরতে পারবেন না লোকটি। বীরবাহাদুর ব্যাপারটা সুদীপ্তদের জানিয়েছেন।

সে রাতের ঘটনার পর দু' দিন ধরে অনেক খোঁজ চালানোর পরও লামা ডং রিম্পুচির আর কোনও খোঁজ মেলেনি। পাওয়া যায়নি সেই পুঁথি আর রাজার মাথাটাও। তবে আজ স্থানীয় দৈনিক সংবাদপত্রে একটা অদ্ভুত খবর বেরিয়েছে। সে কাগজটা সুদীপ্তদের সামনে টেবিলের উপরই রাখা। কাগজে লেখা হয়েছে চারদিন আগে নন্দাদেবীর পথে প্রায় পনেরো হাজার ফিট উচ্চতায় দিনের শেষে তাঁবু ফেলেছিল এক অভিযাত্রী দল। জায়গাটার কাছেই একটা গিরিবর্ত্ম আছে। তাঁবু ফেলার পর একজন ছোকরা শেরপা কী একটা কারণে সেই গিরিবর্ত্মের মুখটায় গিয়ে দাঁড়ায়। তখনই সে নাকি দেখতে পায় এক অদ্ভুত দৃশ্য। আনুমানিক পাঁচশো ফিট দূরে উলটো দিকে একটা পাহাড়ের তাকে বসে আছেন একজন লামা ও বিরাট দর্শন কালো লোমে ঢাকা বাঁদরের মতো এক জন্তু। তার আকৃতি আনুমানিক বারো-চোদ্দো ফুট হবে। কয়েক মুহূর্ত মাত্র। তারপরই তাঁরা দেখতে পেয়ে যান ছেলেটাকে। সেই লামা সঙ্গে-সঙ্গে আঁকড়ে ধরেন প্রাণীটার গলা এবং প্রাণীটাও তাঁকে পিঠে নিয়ে খাড়া দেওয়াল বেয়ে উপরে উঠতে শুরু করে। ছেলেটা যখন সে দৃশ্য দেখানোর জন্য তাঁবুতে দৌড়ে গিয়ে অন্যদের সেখানে নিয়ে পৌঁছয়, তখন আর সে জায়গায় কেউ নেই। শেষ বিকেলের বিষণ্ণ লাল আলো আর হিমেল বাতাস শুধু খেলা করছে নিঃসঙ্গ পাহাড়ের গায়ে। খবরের কাগজের রিপোর্টারের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, এত উঁচুতে ওই ছেলেটা এই প্রথম উঠেছে। মস্তিষ্কে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যাওয়া হ্যালুসিনেশন হতে পারে তার। তা ছাড়া আগের দিন রাতেই নাকি তাঁবুতে ইয়েতির ব্যাপার নিয়ে আলোচনা হয়েছিল, সেটাও তার মনের উপর প্রভাব বিস্তার করে তাকে ওই অলীক দৃশ্য দেখাতে পারে। যাই হোক না কেন, ছেলেটাকে নীচে ফেরত পাঠানো হচ্ছে।

সদ্য পড়া কাগজটার দিকে চোখ রেখে নিশ্চুপ ভাবে বসে ছিল সুদীপ্ত আর হেরম্যান। সুদীপ্ত একসময় বলল, "ধরে নিলাম লামা আর প্রাণীটাকে দেখেছিল ওই ছেলেটা। কিন্তু তা বলে লামাকে পিঠে নিয়ে খাড়া পাহাড় বেয়ে উপরে ওঠা! এটা কি একটু বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে না? কোনও প্রাণীকে কি এতটা পোষ মানানো সম্ভব?"

হেরম্যান মুহূর্তখানেক নিশ্চুপ থেকে বললেন, "অসম্ভব নয়। ইন্দোচিন সীমান্তে থাইল্যান্ডের ঘন জঙ্গলে নাকি 'পিটং-লুয়াং' নামের এক ধরনের বাঁদর আছে, যাদের মস্তিষ্ক উন্নত ও হাত-পায়ের গড়ন অবিকল মানুষের মতো। গল্প-কাহিনিতে শোনা যায় যে, সে দেশের রাজা চুলালঙকর্ণ নাকি তাঁর রাজদরবারে ওই বাঁদরদের একজনকে বালক-কাজের লোক হিসেবে লাগিয়েছিলেন। সব গল্পের পিছনেই কিছুটা সত্যি লুকিয়ে থাকে। হতে পারে লামা ডং রিম্পুচির সঙ্গী অতিকায় আদিম বাঁদর জায়গান্টোপিথিকাসের কোনও টিকে যাওয়া বংশধারা। পিটং-লুয়াংয়ের মতো সে বাঁদরই, শুধু আকারে বড়।"

হেরম্যান এর পর উঠে গিয়ে দাঁড়ালেন খোলা জানলার সামনে। সুদীপ্তও গিয়ে দাঁড়াল তাঁর পাশে। জানলার বাইরে দূরে মেঘমুক্ত নীল আকাশের নীচে আপন গাম্ভীর্য নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে উত্তুঙ্গ গিরিরাজ হিমালয়। সূর্যের আলোয় ঝলমল করছে তার তুষারধবল কিরীটমালা। সেদিকে তাকিয়ে সুদীপ্ত মুগ্ধ হয়ে বলল, "আশ্চর্য সুন্দর!"

হেরম্যান বললেন, "হিমালয় শুধু সুন্দর নয়, রহস্যময়ও বটে। ওরই কোনও তুষারস্নাত প্রান্তরে অথবা নির্জন গিরিসংকটে হয়তো লামা ডং রিম্পুচিকে পিঠে নিয়ে অজানার উদ্দেশে এগিয়ে চলেছে আমার সেই ক্রিপটিড। যাকে কেউ বলে ইয়েতি, কেউ বলে বড়-পা, আবার কেউ ডাকে বরফদেশের রাজা!"